সাহাবায়ে কিরাম
আমাদের প্রেরণা

15

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

WAMY Book Series-15

mvnvev‡q wKivg (iv)
Avgv‡`i †ciYv

Aa¨vcK gwdRi ingvb

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House # 17, Road # 05, Sector # 07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123

mvnvev‡q wKivg (iv) Avgv‡`i †ciYv
অধ্যাপক মফিজুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৫

দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৬

প্রকাশক
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী-১৭, রোড-০৫, সেক্টর-০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
ফোনঃ ৮৯১৯১২৩, ফ্যাক্সঃ ৮৯১৯১২৪

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭১৪-০১৫৯৭৭

শুভেচ্ছা মূল্য
৩০ টাকা মাত্র

Prof. Mofizur Rahman

1st Edition
October 2005

2 nd Edition
Desember 2006

Published by:
Da’wah & Education Department
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House-17, Road-05, Sector-07
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123, Fax: 8919124

Compose & Print
Nabil Computer & Printers
Mobile: 01714-015977

Price
Thirty Taka Only

DrmM

যার স্মৃতি সমগ্র জীবন আমাকে দিয়েছে শুধু যাতনা,
যাকে দেখতে আমার নয়নে রয়েছে সাহারার পিপাসা,
জন্ম ঋণে যার কাছে আমি ঋণী হয়ে আছি,
ধারণ করে রয়েছি যাকে রক্তের প্রতিটি কণিকায়,
হারিয়ে ছিলাম তাকে আমি শৈশবের অতি শৈশবে,
যার বিস্মৃতির মহাসমুদ্রের বেলা ভূমিতে,
সারাটি জীবন আমি শুধু নুড়ি কুড়িয়েছি।
সেই পরম শ্রদ্ধেয় "আব্বার" নাজাতের উপায় হিসেবে
আমার এ লিখনী মহান প্রভুর উদ্দেশ্য নিবেদিত।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

tck Kvjvg

সমস্ত তারিফ সেই আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে যিনি নিখিল জাহানের একমাত্র রব, পালনকর্তা ও হুকুম দাতা।

দরুদ ও সালাম মুহাম্মদ (সা) এর জন্যে যিনি সমগ্র মানবতার জন্যে একমাত্র রাসূল ও রাহ্বার। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে প্রেরণার উৎস যে মানুষগুলো, যাদের বিষয়ে আল্লাহর প্রতিটি অহিতে রয়েছে বর্ণনা। যাদের জীবনে রয়েছে পৃথিবীকে আলোকিত করার আলো। কালের প্রতিটি অধ্যায়ে যারাই লড়েছে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার সংগ্রামে, তাদের সকলের জন্যে আখেরী রাসূলের (সা) সাহাবীদের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম পাথেয়। আমি এ পুস্তকে সে সোনালী যুগের আলোকিত মানুষগুলোর অনুপম চরিত্র ও তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করেছি। যদিও এ ব্যাপারে হক আদায় করার মত যোগ্যতা আমার নেই। তবুও যাদেরকে সমগ্র কলিজা দিয়ে ভালবেসেছি, হাজার হাজার বিপ্লবীদের সামনে শত শত বার যাদের জীবন নিয়ে কথা বলেছি, তাঁদের জন্যে এটা একটি অতি সামান্য প্রয়াস। এই লেখাটি আমার অতি প্রিয়। আমার প্রিয় পাঠকের নিকটও এটা সমাদৃত হবে এ আমার প্রত্যাশা।

বইটিতে লেখা অপর প্রবন্ধটি তাঁদের নিয়ে, যাদের বুকের তপ্ত খুন দ্বীনের বাগানকে করেছে সিক্ত। মিল্লাতে ইসলামিয়া কখনও তাদের রক্তঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। একটি মহান প্রয়োজনের জন্যে তারা তাঁদের সকল প্রয়োজনকে করেছে অপ্রয়োজন। পার্থিব জীনের রঙিন স্বপ্নকে যারা ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছেন নিজ হাতে আর পৌছে গেছেন শাহাদাতের রোমাঞ্চকর মনযিলে। সেই কাংখিত গন্তব্য আমাদের কামনা ও হৃদয়ের মুর্ছনা। কাবাঘরের মুলতাযিমে দাঁড়িয়ে প্রভুর কাছে সে মনযিলের জন্যে কেঁদে ছিলাম।

বইটি যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাবদ্ধ ও প্রকাশিত হলো, আমি তাদের সকলের জন্যে একমাত্র মহান প্রভুর কাছে শুধু দোয়াই করছি। সহৃদয় পাঠকদের কাছে বইটিতে কোন ত্রুটি নজরে এলে আমাকে জানালে বাধিত হব।

হে প্রভু! সাহাবায়ে কিরামদেরকে আমাদের জীবন চলার আলো বানাও
আর শাহাদাতকে কর আমাদের জীবনের শেষ মনযিল।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

GWfvBRwi †ev‡Wi mfvcwZi K_v

যিনি সমগ্র বিশ্বের রব ও স্রষ্টা সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, দরুদ ও সালাম বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর ।

ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী) বাংলাদেশ অফিস, বাংলাদেশের যুব সমাজকে নৈতিক প্রশিক্ষণ, চরিত্র পুনর্গঠন, দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সুষ্ঠু মননশীলতার বিকাশ ও পরিচ্ছন্ন জীবন বোধে উজ্জীবিত করতে সময়োপযোগী বই প্রকাশ করে থাকে । শ্রেষ্ঠ দায়ী, জনাব অধ্যাপক মফিজুর রহমান এর লেখা *Ômvnvev‡q wKivg (iv) Avgv‡`i †ciYvÕ* নামক বইখানা প্রকাশ করার জন্য ওয়ামীকে, সম্মানিত লেখক এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব অধ্যাপক মফিজুর রহমানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি । আল্লাহপাক তাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন । এ ছাড়া যারা বিভিন্ন অবস্থানে থেকে প্রকাশনাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের জন্য ধন্যবাদ ।

আল্লাহ মেহেরবান আমাদের সকলের ক্ষুদ্রতর প্রচেষ্টাকেও কবুল করুন, আমিন ।

c‡dmi W. †PŠaix gvng` nvmvb
সভাপতি এডভাইজারি বোর্ড
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা ।

fwgKv

সমস্ত প্রশংসা সেই রাব্বুল আলামীনের যিনি আসমান ও যমিনের সকল সৃষ্টিকে মানবতার কল্যাণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন । দরুদ ও সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে ।

এক প্রগাঢ় অন্ধকার ছাওয়া জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ মরুচারী আরব বেদুঈনদের বিশ্বাস ও চরিত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন এনে বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করেছিলেন প্রিয় নবী । ত্যাগ, কুরবানী, সবর, এহসান ও দয়ায় পরিপূর্ণ রাসূলের এই বিপ্লবী কর্মসূচীর বাস্তবায়নকে সফল করে তোলার জন্য দরকার ছিল এক বিস্ময়কর অনুসারী কাফেলার । সাহাবীগণ ছিলেন সেই বিস্ময়কর মানুষ যাদের ঐকান্তিকতা ও অনুসরণ করার যোগ্যতা সাধারণ মানুষের বোধগম্যতারও উর্ধ্বে । এই সব বিস্ময় পুরুষের অনুসরণ করার মধ্যেই আমাদের যুবক-তরুনদের সামগ্রিক মুক্তি নিহিত । এই চরম সত্যটি আজ অনেকে ভুলে বসে আছেন ।

বিশ্ব মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা, তাদের চিন্তা চেতনা, চরিত্র পরিবর্তন সাধন ও নয়াজমানার চাহিদা অনুযায়ী একটি উম্মত গড়ে তোলা ওয়ামীর অন্যতম প্রয়াস্ । ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি যুবকদের উপযোগী সাহিত্য প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে । বর্তমান বইখানা সেই উদ্যোগেরই একটি অংশ ।

স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবীদ ও বাগ্মী অধ্যাপক মফিজুর রহমান রচিত *Ômvnvev‡q wKivg Avgv‡`i †ciYvÕ*একটি সুখপাঠ্য, উজ্জীবক ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী অনন্য গ্রন্থ ।

আমরা বিশ্বাস করি এই বইটি বাংলাদেশী যুবক-তরুনদের মাঝে সাহাবায়ে কিরামদের ব্যাপারে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং তাদেরকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে । আমরা বইটির লেখককে তার এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । আশা করি বইটি সকলের কাছে সমাদৃত হবে । আল্লাহ আমাদের নেক আমল সূমহ কবুল করুন । আমিন ।

Wv. †gvnv¤§` †i`Iqvbi ingvb
ডাইরেক্টর
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা ।

cKvk‡Ki K_v

mwPcÎ

পৃথিবীর সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি বা নক্ষত্র সাহাবায়ে কিরাম (রা)। যারা সরাসরি আলো পেয়েছেন মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিকট থেকে। সমূদ্রগামী যানগুলো যেমনি আকাশের নক্ষত্র দেখেই নিজেদের পথ খুঁজে নেয় তেমনি সাহাবায়ে কিরামদের দেখে মানবজাতি তাদের আসল মঞ্জিলে পৌছে যেতে পারে।

যুবকেরা প্ররেত্যক জাতির সেরা অংশ। World Assembly of Muslim Youth (WAMY) বিশ্বের যুব সমাজকে নক্ষত্রের সন্ধান দিয়ে সিরাতুল মুসতাকিমে পরিচালিত করার কাজ করে যাচ্ছে। বই জ্ঞানার্জন ও জীবন গঠনের এক উত্তম উপায়। এ কাজের একটি অংশ হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায় বই প্রকাশ করা।

Ômvnvev‡q wKivg (iv) Avgv‡`i †ciYvÓ বইটি চমৎকার ভাষা ও সাবলিল সাহিত্যের মাধ্যমে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক অধ্যাপক মফিজুর রহমান তার লিখনির মাধ্যমে রাসূল (সা) এর সঙ্গীদের বৈচিত্রময় জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা) অনুপ্রেরণাদায়ক জীবন আল্লাহর নিশ্চিত সন্তোষ লাভের মাধ্যম। শাহাদাতের তামান্না এবং জীবনের বাস্তব উদাহরণ যুব সমাজকে আল্লাহর পথে চলতে সাহায্য করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বইটি প্রকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

AvjgMxi †gvnv¤§` BDQd

ইনচার্জ

দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট

ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

mvnvev‡q wKivg (iv) Gi
gnvb ghv`v I Abb¨ ˆewkó¨

❑ cwiPq

صحابة ‘সাহাবা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ সঙ্গী বা সাথী। আর **اصحاب** ‘আসহাব’ এর বহুবচন। আর স্ত্রীলিঙ্গে **صحابية** ‘মহিলা সাহাবা’। তাঁরা মানবজাতির মধ্যে এমন এক সম্মানিত জামায়াত যারা মুহাম্মাদ (সা) কে পেয়েছেন ও তাঁর রিসালতের উপর ঈমান এনেছেন, তাঁকে ভালবেসেছেন ও ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। এর একটি শর্ত যদি না থাকে তারা ‘সাহাবা’ বলে গণ্য হবে না। কেউ নবীজি (সা) কে পেয়েছেন কিন্তু ঈমান আনেননি আবার কেউ মুরতাদ হয়ে গেছে। সাহাবীদের পরিচয় প্রদানে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ কথাটি বলেছেন সমস্ত জামানার হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীস গবেষকদের উস্তাদ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহ) –

من صحب النبى صلى الله عليه وسلم أو رأه من المسلمين فهو من أصحابه .

অর্থাৎ যাঁরা রাসুলে পাক (সা) কে দেখেছেন অথবা মুসলমান হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাই সাহাবী।

রাসূলে পাক (সা) এর এ সাহাবীদের জীবন যতই অধ্যয়ন করেছি ততই অভিভূত হয়েছি, আবেগে আপ্লুত হয়েছি, অজান্তে অশ্রুসিক্ত হয়েছি, আর হতবাক হয়েছি, এ মানুষগুলোর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে। এক সময় যারা জাহেলিয়াতের তিমিরে ছিল, পাপাচারে লিপ্ত ছিল, রক্তপাত, খুন, সন্ত্রাস ছিল যাদের জীবন, দুনিয়ার আজ পর্যন্তের ইতিহাসের এ পাপীষ্ঠ লোকেরা নবীজির (সা)– পবিত্র সাহচর্যে পরিণত হয়েছিল সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবে। একটি সূর্য যেমন অসংখ্য আয়নায় বিম্বিত হতে পারে, তেমনি লক্ষাধিক সাহাবীর জীবনের দর্পনে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়তী সূর্য।

❑ mvnvev‡q wKiv‡gi ghv`v

সাহাবীদের মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কোন অবহেলার সুযোগ নেই। যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কিতাবে রয়েছে বর্ণনা রাসূলে খোদার হাদীসে রয়েছে প্রশংসিত বাণী। উম্মতের ঐক্য, পথনির্দেশ ও আজকের জটিল সমস্যা সমাধানে সাহাবায়ে কিরামদের মর্যাদা ও জীবন অনুসরণের এর কোন বিকল্প নেই। নিম্নে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা বর্ণিত হলো।

❑ mKj wKZv‡e hv‡i Av‡jwPZ

তাঁরা শুধু উম্মাতে মুহাম্মদী (সা)-এর শ্রেষ্ঠ মানব নন, তাঁরা সকল যুগের, কালের ও সকল পয়গাম্বরের উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) এর পরে এদের মাকাম। আল্লাহ তায়ালা পূর্বের সকল কিতাবে সাহাবাদের আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে তাঁদের চরিত্র ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم فى الانجيل .

“তাদের এ বৈশিষ্ট্য আলোচিত তাওরাত ও বর্ণিত হয়েছে ইঞ্জিলে।” – সূরা আল-ফাতাহ : ২৯

❑ AvKv‡ki †hb a“eZviv

নিকষ কালো রাতে দিকভ্রান্ত মুসাফির বা মহাসাগরে ভাসমান দিশাহারা নাবিক আকাশের তারা ধরে পথ খুঁজে নেয়; জীবন লক্ষ্যহারা নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে চলমান মানবতার জন্য সাহাবারা যেন আকাশের ধ্রুবতারা। তাঁদের জীবনকে অনুসরণ করে মানুষেরা খুঁজে পাবে জান্নাতের পথ। রাসূল (সা) বলেন ঃ

أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم .

“আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ, তাঁদেরকে অনুসরণ করলে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে”।

তাঁদের মর্যাদা ও বুজর্গী এতই উপরে যে আল্লাহ তায়ালা সাহাবাদের উপর তাঁর রেজামন্দির সংবাদ কিতাবে অহি করেছেন।

السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . (التوبة : 100)

অর্থাৎ “যে সব আনসার ও মুহাজিররা প্রথমে ঈমানের দাওয়াত কবুল করেছেন আর যারা তাঁদেরকে সততার সাথে অনুসরণ করেছেন তাদের উপর আল্লাহ

তায়ালা রাজি হয়েছেন, তাঁরাও আল্লাহতে সন্তুষ্ট।” – সূরা আত-তাওবাহ : ১০০

আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ামতে তাঁরা ধন্য। তাঁরা নবীদের মত মাসুম বে-গুনাহ নহেন। তাঁদের জীবনে গুনাহ হয়েছে কিন্তু তা তাঁদেরকে এতই অনুতপ্ত করেছে যে, তাওবার ক্রন্দনে তাদের পাপ শুধু মোচন হয়নি বরং তা তাঁদের জীবনকে করেছে আরও নির্মল। হযরত মায়েয ইবনে মালেক নবীজির (সা) দরবারে এসে নিজের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ব্যভিচার থেকে আমাকে পবিত্র করুন, আমার উপর জেনার শাস্তি বলবৎ করুন। বারবার সাক্ষ্য দেয়ার পর নবীজি (সা) তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দেন। তার মৃত্যুর দুই দিন পর নবী করীম (সা) মায়েয-এর জন্যে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন আর বলছিলেন আমার সাহাবী মায়েয বিন মালেকের তাওবা যদি কোন অন্যায়কারী জাতির মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় তবে আল্লাহ তায়ালা সে কওমকে মাফ করে দেবেন।

দ্বীনে মুহাম্মদীর (সা) পয়গামকে সূর্যের উদয় ও অস্তের বিস্তৃত সীমানায় সঠিক ও যথার্থভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্যে যে কুরবানী ও ত্যাগ সাহাবীরা দিয়েছেন তাঁর আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। সাগরের ভীষণ উত্তালতা, পাহাড়ের কঠিন দুর্গমতা, সাহারার অসহ্য উষতা, অরণ্যের ভয়াবহ গহিনতা তাদের চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। সব বাধা মাড়িয়ে তাঁরা পৌঁছে গেছেন প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি প্রান্তরে।

❑ *D¤§‡Zi Rb¨ hvix AvgvbZ*

উম্মতে মুহাম্মদীর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যতটুকুন নির্ভেজাল ইসলামী অনুশাসন আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সাহাবায়ে কিরামেরই অবদান। উম্মতের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে তাঁদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। তাঁদেরকে সন্দেহ যুক্ত করা, তাঁদের মর্যাদার উপর আঁচড় কাটা দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। সমগ্র দুনিয়া তাঁদের কাছ থেকে দ্বীন ইসলামের খবর পেয়েছে আর নবী করীম (সা) এর তামাম হাদীস তাঁদের থেকে বর্ণিত। সুতরাং দুশমনের যবান ও কলম যদি তাঁদেরকে বিতর্কিত ও সন্দেহজনক করে তুলতে পারে তবে তাদের প্রচারিত ও বর্ণিত সব কিছুই সন্দেহের আবর্তে পড়ে যাবে, নড়ে উঠবে ইসলামের ভিত্তি আর দ্বীনিপ্রাসাদের প্রতিটি দেয়ালে দেখা দেবে ফাটল।

اَصحابِی اَمانةٌ لأمتی . (مسلم)

“আমার সাহাবীরা তোমাদের নিকট আমানত স্বরূপ।” –মুসলিম

রাসূলে পাক (সা) তাঁদের নিকট রেখে গেছেন দ্বীনের আমানত আর তাঁদেরকে রেখে গেছেন গোটা উম্মাহর নিকট আমানত।

❑ *ivm‡ji hvix AwZ wcq*

সাহাবায়ে কিরামকে ইকরাম ও সম্মান করা ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের বিষয়ে অসুন্দর ও অশালীন কথা বলা থেকে স্বীয় জিহবা ও কলম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রাসূলের মায়া যে হৃদয়ে রয়েছে সে হৃদয়ে সাহাবীদের বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করা অসম্ভব। সাবধান! তাঁদের উপর আক্রমণের তীর নবীয়ে পাকের কলিজায় বিদ্ধ হবে। নবীজি (সা) বলেন–

اَللّٰه اَللّٰه فی اَصحابِی لا تتخذُوهم غَرضا من بعدی فَمن اَحبهم فَبِحبی اَحبهم ومن اَبغضهم فَبُغضی اَبغضهم ومن اَذَا هم فَقَد اَذَانِی ومن اَذَانِی فَقَد اَذَا اللّٰه .

অর্থাৎ “সাবধান! আমার সাহাবীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদের কোন বিষয়ে অশুভ ধারণা পোষণ করবে না। তাদেরকে তারাই ভালবাসবে যাদের হৃদয়ে রয়েছে আমি রাসূলের ভালবাসা, তাদের ব্যাপারে সেই লোকেরা দুশমনী করবে আমার সাথে যাদের দুশমনি রয়েছে। তাদেরকে যারা আঘাত করে সে আঘাতে আমি আহত হই। আর আমাকে যারা কষ্ট দেয় তারা বরং আল্লাহ তায়ালাকেই কষ্ট দেয়।” – ত্বাবারানী

তবে ইতিহাসের সঠিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনে সঠিক কথাটি যথার্থভাবে পেশ করা উচিত। সে ক্ষেত্রে কাউকে এড়িয়ে বা কাউকে বাড়িয়ে কিছু বলা ও লিখা সুস্পষ্ট জুলুম। বিদ্বেষ যেমন সীমালংঘন করে তেমনি অতিরিক্ত আবেগও সীমা ছাড়িয়ে যায়। এর কোনটাই ইনসাফ নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং জুলুম থেকে দূরে থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

ان اللّٰه لا یحب الْمعتدین .

“আল্লাহ তায়ালা সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেন না” । –আল-কুরআন

❑ gvbexq Î"wU wePvi ¯vfvweK

সাহাবীদের জীবনে মানবীয় ত্রুটি হওয়া একান্ত স্বাভাবিক । কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো সামাজিক জীবনের বিতর্কিত আচরণ ও সিদ্ধান্ত নবীয়ে পাকের (সা) মানদন্ডে পর্যালোচিত না হলে পরবর্তীরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে । যেমন উষ্টের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) -এর বিরুদ্ধে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা) এর নেতৃত্ব দান । এ থেকে নারী নেতৃত্ব বৈধ করার কোন সুযোগ নেই । আবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা) স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে মুসলমানদের রায় ছাড়া পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দানকে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না ।

হযরত আয়েশা (রা) তাঁর উপরোক্ত ভুলের জন্যে সমগ্র জীবন কেঁদেছেন, এতই কাঁদতেন যে চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত ।

আবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) স্বীয় ভুলের জন্য এতই অনুতপ্ত ছিলেন যে, জীবন সায়াহ্নে তিনি ইয়াজিদের বিষয় নিয়ে বার বার কাঁদতে ছিলেন ও তাঁর প্রভুর নিকট ক্ষমা চাচ্ছিলেন ।

উপরোক্ত আলোচনায় সাহাবীদের কাকেও অমর্যাদা করা হয়নি, কেউ যদি তাই মনে করেন তবে সে সমস্ত বুজুর্গরা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর মর্যাদার উপর আঘাত করেন । যে ভুলের জন্যে তাঁরা নিজেরাই অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করেছেন, তওবা করেছেন সে ভুলের কালিমা তাদের জীবনে আর নেই তবে উহাকে ভুল না বলাও চরম ভুল ও বাড়াবাড়ির নামান্তর ।

❑ we‡kl fv‡e hvPvB wbevPZ

সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে আরও বলতে চাই ইসলামের মধ্যে উম্মতের দ্বীনি মর্যাদার যতগুলো অবস্থান রয়েছে মুফাসসির, মুজতাহিদ, আওলিয়া, মুত্তাকী, পীর মাশায়েখ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কোন বুজুর্গ সাধারণ সাহাবীদের সাথেও তুলনায় আনা সম্ভব নয় । এদের সমগ্র জীবনের তাকওয়ার পুঁজি রাসুলল্লাহ (সা) দরবারে এক মুহূর্ত অবস্থানের সাথে তুলনীয় নয় । ইহাদের বুজুর্গী যেন অতলান্ত সমুদ্রের অথৈ জলরাশির কাছে সুচাগ্রে জলকণা । নবীজির (সা) সাহাবী হওয়ার জন্য ও তাঁর দ্বীনের সাহায্যের প্রয়োজনে এ জামায়াতকে আল্লাহ তায়ালা বাছাই করে নিয়েছেন । ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

فَاختارهم اللّٰه لصحبة نبيه ونصرة دينِه . (ابو داؤد)

“আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে নবীজির (সা) সাহাবী হওয়ার ও তাঁর দ্বীনকে সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে বাছাই করে নিয়েছেন ।” –আবু দাউদ ।

এ ব্যাপারে এ কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা সমস্ত উম্মতের দায়িত্ব । এরা গোটা উম্মতের অহংকার ও মর্যাদা । তাঁদের মহান মর্যাদাকে মসিময় করার যে কোন চক্রান্তকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করতে হবে । উম্মতের একটি বিভ্রান্ত অংশ শিয়াদের একটি উপদল সাহাবায়ে কিরামদের কারো কারো ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ করছে । এমনকি সাইয়্যেদুনা আবু বকর (রা), উমর ফারুক (রা) ও আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা) -এর ব্যাপারে তাদের মন্তব্য আপত্তিকর । আল্লাহ তায়ালার কালাম ও রাসূলে পাকের সহীহ হাদীসের মধ্যে যাদের ব্যাপারে প্রশংসা এসেছে তাদেরকে অসম্মানিত করার সময় আল্লাহ ও রাসূলের উপর যদি তাদের ঈমান জীবিত থাকে তবে অবশ্যই তাকে তারা বাধা প্রদান করত । এ বিষয়ে নবীজির (সা) সতর্কবাণী প্রনিধানযোগ্য ।

اذَا رأيتم الذين يسبونَ اَصحابِى فَقُولُوا لَعنةُ اللّٰه على شركُم .

“আমার সাহাবীদের উপর অপবাদ দানকারীকে অবশ্যই প্রতিবাদ করে তোমরা বলবে, সাহাবী ও তোমার মধ্যে যে নিকৃষ্ট তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ।” –তিরমিযী

❑ mvnvex‡`i gh©v`vi ZviZg¨

মহানবী (সা) এর নবুয়তি চুম্বকের যাদুময় স্পর্শ লাভে যাদের জীবন হয়েছে ধন্য তাঁরা সকলে সাহাবী । তাঁদের মকাম বা অবস্থান এক ও অভিন্ন । ইহা এমন দরজা যা দিয়ে আর কারো প্রবেশ করা সম্ভব নয় । এ দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে । কোন আমল দিয়ে এ মর্যাদায় সমাসীন হওয়া যাবে না । এখানে যারা পৌঁছেছেন তারা সকলে সাহাবী হিসেবে এক দরজার হলেও তাদের নিজেদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য স্পষ্ট ।

নিম্নে মর্যাদা ক্রমানুসারে সাহাবীদেরকে বিন্যাস করা হলো ঃ

❑ Ljvdv‡q iv‡k`xb

সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) এর জামায়াতের মধ্যে এঁরা অনন্য মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা সাহাবীদের নেতা। তাঁরা রাসূলে পাকের পরে উম্মতের নেতৃত্বের হাল ধরেছেন। নবীয়ে পাক (সা) তাঁর ইন্তেকালের পর ৩০ বছর খিলাফাত আলা মিনহাজিহিন্নাব্যুযাত থাকবে বলে ইশারা করেছেন–

اَلْخلافَةُ بعدى ثَلاثُونَ سنةٌ .

"আমার পরে খিলাফাত ত্রিশ বছর থাকবে"। –তিরমিযী

সাইয়্যেদিনা আবু বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা) আলী (রা)।

আরবী

ইবনে উমার (রা) বলেন রাসূল (সা) সারাজীবন বলতেন, আবু বকর (রা) উমার (রা) ও উসমানের (রা) উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন। – তিরমিযী

আরবী

নবীজি (সা) বলেন, 'আলী আমি হতে আর আমি আলী হতে এবং তিনি মুসলমানদের বন্ধু' –তিরযিমী

❑ *Avkv iv‡q gewk ivn*

সমস্ত সাহাবায়ে কিরামদের (রা) উপর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির শুভসংবাদ রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে দশজন সাহাবী এমন যারা জান্নাতী বলে রাসূলের (রা) পবিত্র জবানে ঘোষণা দিয়েছেন।

নিম্নে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

.....

হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (সা) বলেনঃ "আবু বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়ের (রা), আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), সাঈদ বিন যায়েদ (রা) এবং আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) এরা সকলেই বেহেশতী।" –তিরযিমী

❑ *Avn‡j evBZ I D¤§j gwgbœb*

নবী পাকের (সা) পরিবার সমস্ত উম্মতের জন্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। রাসূলে পাকের (সা) আওলাদ ও হুজুরের (সা) মুহতারামা স্ত্রীগণ যাঁরা গোটা উম্মতের জননী ও সকলের নিকট সম্মানের। আহলে বায়তের মধ্যে রয়েছে আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন (রা)। এঁরা বিশেষ মর্যাদাবান। নবীজি (সা) আহলে বাইত এর জন্য সাদকা, মানত হারাম করে দিয়েছেন।

আরবী

নিজ চাদরের মধ্যে আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনকে (রা) নিয়ে নবীজি (সা) বলেন, হে মাবুদ! এঁরা আমার আহাল।

আরবী

হযরত যায়িদ বিন আকরামা (রা) নবীজি (সা) থেকে বর্ণনা করেন, যারা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের (রা) বিরুদ্ধে লড়বে আমি রাসূল (সা) তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। –তিরমিযী

নবীজির (সা) স্ত্রী ও উম্মুল মুমেনীনদের সংখ্যা ১৩ জন। এঁদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন কুরাইশ বংশীয়। বাকি ৭ জন অন্যান্য বংশীয়।

নবী করীম (সা) এর সাথে একাধিক বিবাহের কারণ ছিল এত বেশী যে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা জরুরী। উম্মতের সামনে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের আদর্শ, সমাজের বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার কেউ বেশী বয়সের, কেউ একেবারে কম বয়সের, কারো বেশী সন্তান, কেউ নিঃসন্তান, কেউ বিধবা কেউ কুমারী, কারো আগের সন্তান ছিল, কারো ছিল না, কেউ সম্পদশালী কেউ গরীব, কেউ উচ্চ বংশ কেউ আবার সাধারণ। কেউ আযাদ কেউ আবার মামলুক, কেউ উচ্চ শিক্ষিত আবার কেউ সামান্য শিক্ষিত, কেউ সুন্দরী আবার কেউ ছিলেন কম সুশ্রী, কেউ শান্ত মেজাজের আবার কেউ কঠোর মেজাজের ইত্যাদি বিভিন্ন বংশের, রুচির, অবস্থার, বয়সের স্ত্রীদের সমাহার নবীর পরিবারে আসার আল্লাহ তায়ালা ব্যবস্থা করেছিলেন যেন সকল শ্রেণীর নারীদের নিয়ে সুন্দর পরিবার গঠন করার বাস্তব আদর্শ মহানবীর জীবন থেকে মানবেরা খুঁজে পাই। যে রাসূলের (সা) জীবনকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল লক্ষাধিক সাহাবীর। অনুরূপভাবে নবীজি (সা) একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের শিক্ষা গ্রহণে আমার মনে হয় বহু রমনীর প্রয়োজন ছিল। রাসূলের (সা) সাহচর্যের বরকতে যারা হয়েছেন সাহাবীর মর্যাদায়। উম্মুল মুমিনীনরা আরও ঘনিষ্ঠ সাহচার্যের কারণে বেশী ধন্য হয়েছেন। তাঁরা দুনিয়ার

ও পরকালীন জিন্দেগীতে নবী করিম (সা) এর পরিবারের সদস্য থেকে উম্মতের জননী হয়ে থাকবেন।

খলীফাগণ নবী পত্নীদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা) তাদের জন্য ৪ লাখ ৪০ হাজার দিরহামের সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।

❑ c g h‡Mi gnwRi I Avbmv‡ii

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যাদের জীবনে নেমে এসেছিল অকথ্য নির্যাতন ও যুলুম। ৫ম হিজরীর শেষের দিকে যখন কুরাইশদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা চরমে পৌঁছে। তখন হুজুর (সা) সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিযরতের নির্দেশ দেন। ১১ জন পুরুষ+৪ জন মহিলা = মোট ১৫ জন প্রথম মুহাজির। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), জাফর বিন আবু তালিব, আবদুর রহমান বিন আওফ, মুসআব বিন উমাইর, উসমান বিন মাযউন (রা)।

১০ম হিজরীতে হযরত উমর (রা) আবদুল্লাহ বিন জাহশ, আমের বিন রাবীয়া, তার স্ত্রী লায়লা (রা) সহ আরও কতিপয় ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী মুসলমানদের সাহায্য করেন। নিজে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসূলে পাক মদীনায় নাজ্জাশীর জানাজা নামায আদায় করেন। মদীনাবাসীরা মুহাজিরদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের ও সহযোগিতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসা করেছেন তাঁরই কালামে পাকে–

আরবী

"সে সব মুহাজির ও আনসারেরা যারা প্রথমে ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল আর তারাও যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ রাযী আর তারাও আল্লাহর উপর রাযী"। – সূরা আত-তাওবা : ১০০

রাসূলে পাক মুহাজির ও আনসারদের শানে অনেক কথা বলেছেন, তাদের জন্য দোয়া করেছেন ঃ

আরবী

"আল্লাহ তায়ালা! আপনি মুহাজির ও আনসারদের মাফ করে দিন।" – বুখারী

আরবী

রাসূল (সা) বলেন, "আনসারদের ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ আর তাদের ব্যাপারে দুশমনী মুনাফেকীর আলামত।" – মিশকাত

❑ Avn‡j AvKvev

মক্কা থেকে ২ মাইল দূরে হেরা পাহাড় ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম 'আকাবা'। সে গোপন স্থানে নবুওয়তের একাদশ সনে মাত্র ১২ জন ও পরের বছর উক্ত স্থানে ৭৩ জন মদীনাবাসী এদের মধ্যে ২ জন মহিলা সহ দ্বীনের ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেন ও নবীজিকে (সা) মদীনায় চলে যাওয়ার দাওয়াত দেন। ৫টি বিষয়ে (ক) শিরক (খ) ব্যভিচার (গ) চুরি (ঘ) সন্তান হত্যা (ঙ) অপবাদ থেকে বেঁচে থাকার উপর কসম করান। অতঃপর যে কোন অবস্থায় রাসূলকে সাহায্য করার জন্যে তারা প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসার জবাবে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে নবীজির (সা) হাতে হাত রেখে কসম করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা কসমের সময় বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্যে স্ত্রী, ছেলে মেয়ে, সহায় সম্পদ সমস্ত কিছু কুরবানী দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি"। রাসূলের চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে। মদীনাকে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ হিসেবে প্রস্তুত করার ব্যাপারে এ শপথ গ্রহণকারী আনসারদের ভূমিকা অনেক বেশী।

❑ Avn‡j e`i

২য় হিজরীর রমজানে বদর সংগঠিত হয়। আবু জাহেলের নেতৃত্বে এক হাজার সশস্ত্র কাফেরদের মুকাবিলায় মুহাম্মদ (সা) এর সেনাপতিত্বে ৮৩ জন মুহাজির ও বাকিরা আনসার মোট ৩১৩ জন বদরী সাহাবী সামান্য অস্ত্রসহ আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হন। ৭০ জন কাফের নিহত ও ১৪ জন মুসলমান শহীদ হন।

আরবী

"হে আল্লাহ! আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করুন। আজকের দিনে মুসলমানেরা পরাজিত হলে আপনার বন্দেগীর জন্যে কে থাকবে।" –বুখারী

বদরের ময়দানে আল্লাহর ফিরিশতা লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন–

আরবী

আল্লাহ আপনার প্রার্থনার জবাবে এক হাজার ফেরেশতা আপনার সাহায্যে যুদ্ধে প্রেরণ করেন।

ইসলামের এ প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বদরী সাহাবীদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কিরামেরা বদরী সাহাবীদেরকে অত্যন্ত সম্মানের নয়নে দেখতেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতা (রা) রাসূলে পাকের (সা) মক্কা আক্রমণের সংবাদ পরিবার ও আত্মীয়দের জানিয়ে দিতে গোপনে চিঠি পাঠানোর পর ধরা পড়ে নবীজি (সা) এর দরবারে নীত হলে তিনি এ বলে ক্ষমার নির্দেশ দেন– যেহেতু তিনি বদরী সাহাবীদের অন্তর্গত। আল্লাহ তায়ালা আহলে বদরকে মাফ করে দিয়েছেন।

❑ Avn‡j gvkvnx`

যে সমস্ত সাহাবী রাসূলের (সা) সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা মর্যাদাবান। প্রথমে অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। জিহাদে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের উপর মর্যাদাবান যারা জিহাদে অংশ নেয়ার সুযোগ পাননি।

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা সকলের উপরে আল্লাহর কুরআন বলছে–

আরবী

আল্লাহর নিকট মুজাহিদ এর মর্যাদা গৃহে অবস্থানকারীদের চাইতে অনেক বেশী। – আন নিসা : ৯৫

সাহাবীদের মধ্যেও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা অপরদের উপর বেশী যদিও জিহাদে অংশ নেয়নি এমন অন্ধ, বৃদ্ধ ছাড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে পূর্বে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা পরবর্তীদের চাইতে বেশী।

❑ mvnvev‡q wKivg‡`i Abb¨ ˆewkó¨

তাঁদের চরিত্রের সৌন্দর্যপূর্ণ যে তা সমগ্র মানবগোষ্ঠী থেকে তাঁদেরকে আলাদা করে দিয়েছে। আকাশের অসংখ্য তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদ যেমন স্বীয় আলোতে সমুজ্জ্বল; মানবতার বিশাল আকাশে নেককারদের অসংখ্য তারকার ভীড়ে সাহাবীরা যেন বিকশিত চন্দ্র। তাঁদের জীবনের ছোট থেকে বড়, অসাধারণ থেকে সাধারণ সব কিছুই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আপন মহিমায় ভাস্বর।

একটি নিবন্ধে ও আলোচনায় সংকুলান করা দুরূহ ব্যাপার। আমি চেষ্টা করব আলোচনার দরিয়া থেকে কয়েক ফোঁটা তুলে ধরতে।

❑ Cgvbx `pZv

প্রথমে আমি সাহাবীদের ঈমানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে চাই। একজন সাহাবীর গোটা জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় ছিল ঈমান আনার ঘটনা। গায়েবের উপর তাদের বিশ্বাস ছিল জাহেরের উপর আমাদের বিশ্বাস যেমন। তাদের বিশ্বাস হালকা ও মামুলি কোন বিষয় ছিল না। তাদের জীবন ও জীবনের সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ামক শক্তি ছিল তাদের ঈমান। তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও এর ব্যবহার তথা চলার প্রতিটি কদম, জবানের প্রতিটি শব্দ, চোখের প্রতিটি চাহনি, হাতের প্রতিটি স্পর্শ ছিল ঈমানের শাহাদাত। এ ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের। পৃথিবীর সকল মানুষ তাদের তাবৎ প্রচেষ্টায় তাদের একজনকেও ঈমানের ময়দান থেকে এক চুল সরাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের বুকের ওপর পাথর চাপা দেয়া হয়েছে, এক একটি অঙ্গ কেটে পৃথক করা হয়েছে, জলন্ত কয়লার ওপর তাদেরকে ফেলে দেয়া হয়েছে, শূলিতে বসিয়ে তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তারা অকথ্য নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছেন, রক্ত দিয়ে জমিন সিক্ত করেছেন, জবাই করা প্রাণীর মত ছটপট করে করে জীবন কুরবান করেছেন, কিন্তু ঈমান বিসর্জন দেননি।

পাহাড় যেমন করে অনড় অচল হয়ে জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সাহাবীদের হৃদয়ের জমিনে ঈমানের পাহাড় এর চাইতেও কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। হযরত কাতাদা (রা) যখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কে সাহাবীদের ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বলেন–

আরবী

"তাদের ঈমান হৃদয়ে এভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল পাহাড় যেমন জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।"

আ'মালী যিন্দেগীর দিকে তাকালে সাহাবয়ে কিরামের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্যণীয় কিন্তু মানের দিকে নজর করলে তাদের সকলকে সিদ্দিকীনদের মকামে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহর (সা) কালামের উপর বিন্দু-বিসর্গ তাঁদের সন্দেহ ছিল না। এক্ষেত্রে তাঁদের ঈমান ছিল ইয়াক্বীনদের পর্যায়ে তাদের ঈমানের মধ্যে মুনাফিকির কোন অস্তিত্ব ছিলনা।

❑ Kdi‡i gKv‡ej̈vq Av‡cvIxb

নবীজি (সা) সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে সূরা ফাতহের আখেরী রুকুতে যে পাঁচটি মৌলিক দিক আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে ও পূর্বের কিতাবে যিকির করেছেন তা অবশ্যই আলোচনায় আসা দরকার।

আরবী

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল ও তার সাথে এমন এক জামায়াত মানুষ রয়েছে যারা 'কুফরীর সাথে আপোষহীন'। -সূরা ফাতাহ : ২৯

কুফরীর যে কোন চ্যালেঞ্জকে তারা সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছেন। তাঁদের রক্ত, বংশ, সম্পর্ক ও আত্মীয়তা কোন কিছুই দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদেরকে দুর্বল করেনি। দ্বীনের উপর এগুলোকে তাঁরা হিসেবের বস্তু হিসেবে নেয়নি। শত্রুর হাজার হাজার সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও তাঁরা ছিলেন নিঃশংক, নির্ভয়। ইরানীদের রাজধানীতে রুস্তমের দরবারে দশ সহস্র সৈন্যের উলঙ্গ তরবারীর মাঝখানে যে কোন চ্যালেঞ্জ এর জওয়াব দানে প্রস্তুত ৭০ জন সাহাবী 'সাথে দন্ডায়মান' আল্লাহর তরবারীর নবীজির প্রিয় সাহাবী মুসলমানদের সেনাপতি হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা)। হক ও নাহকের ময়দানে আপন রক্তের উপর তরবারী চালাতে এতটুকুও দ্বিধা করেনি। বদরের কঠিন দিনে নিজের ভাই আপন হাতে নিহত হয়েছে; হযরত আবু উবায়দা স্বীয় পিতাকে যে বদরের যুদ্ধে খোলা তরবারী হাতে নবীজির (সা) দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাকে কতল করে তার লাশ জমিনে রেখে দিয়েছিলেন।

❑ *mv_x‡`i cÖwZ ingw`j*

তাঁরা নিজেদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের সাথীদের ব্যাপারে ছিলেন রহম দিল–

আরবী

তাদের দ্বীনি জিন্দেগীতে একের জন্যে অপরের হৃদয় ছিল সংবেদনশীল। ভাইয়ের প্রয়োজনকে সর্বদা নিজের উপর তারা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মক্কার সর্বহারা মুহাজিরদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য নবীজির (সা) নির্দেশের পর মদীনার আনসারেরা ভ্রাতৃত্বের যে নিদর্শন দুনিয়ার সামনে পেশ করলেন ইতিহাসের পাতায় এর দ্বিতীয় আর কোন নজীর নেই। শুধু ভাই হিসেবে নেয়নি বরং নিজের বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে দ্বীনি ভাইকে অর্ধেক মালিকানা দিয়েছেন। অথচ আমরা ওয়ারিসদেরকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করছি। ঘরের মধ্যে মাত্র একজনের খাবার, রাসূলুল্লাহর মেহমান ঘরে। হযরত তালহার স্ত্রী বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করলেন মেহমানের সামনে খাবার নিয়ে বাতি নিভিয়ে দেবেন। গৃহস্বামী খাওয়ার ভান করল আর মেহমান খাবার খেল। আল্লাহ তায়ালা অহিতে বলে দিলেন–

আরবী

'তারা নিজেদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে ভাইয়ের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়।" – আল কুরআন

❑ *Zvnv¾` ¸Rvi*

তারা ছিলেন আল্লাহর হুজুরে দন্ডায়মান ও সিজদায় অবনত থেকে নিশি যাপনকারী–

আরবী

'তোমরা তাদেরকে দেখবে রুকু ও সিজদায় অবনত"।

সমস্ত সাহাবী ছিলেন সালাতের নিষ্ঠাবান পাবন্দ। সালাতে মাকতুবা ছাড়াও তাঁরা সকলেই ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজার। সোয়া লক্ষ সাহাবীদের মধ্যে একজনকেও এমন পাওয়া যাবে না শেষ রাতে যাদের পিঠ বিছানার সাথে ছিল। হায়! আজ মুসলমানদের লাখের মধ্যে একজনকেও এমন পাওয়া সুকঠিন। আল্লাহর কুরআন সাক্ষ্য দিয়ে বলছে–

আরবী

"যারা রুকু ও সিজদায় তাদের রাত শেষ করে দিয়েছে"। – ফুরকান : ৬৪

❑ *mšó †_‡K †e-†bqvR*

তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের প্রয়োজন পূরণে তাঁরা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে হাত পাতে নাই। আল্লাহর রেজামন্দি ছিল তাদের একমাত্র কাম্য।

আরবী

"তারা আল্লাহর সন্তোষ ও তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে।"

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি এমন কি সমগ্র পৃথিবীর মানবের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি তাঁদের হিসেবের বিষয় নয়। দুনিয়ার কোন জাতি কি চায় কিভাবে চলে, তাকে

তাঁরা থোড়াই কেয়ার করে। আল্লাহকে রাজি করার প্রয়োজনে সমগ্র দুনিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে তাঁরা প্রস্তুত। আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে তাঁদের নিকট সমগ্র পৃথিবীর পার্থিব সব কিছু কদমের ধুলার চাইতেও কম মূল্য বহন করে। বিশ্ব যদি তাঁদের বিরুদ্ধে অবরোধ কার্যকরি করে, বেঁচে থাকার শেষ সামগ্রী কেড়ে নেয়, তবে তারা অরণ্যের পাতা খেয়ে জীবন কাটাবে। নাফরমানীর শর্তে ঐ ক্ষুধার্ত নবীর সাহাবীরা খাদ্যের একটি দানা অথবা পিপাসায় এক কাতরা পানি পান করবে না। লাগাতার সিয়াম পালন করে আজিমতের রাজপথ দিয়ে বরণ করে নেবে শাহাদাতের মৃত্যু। কোন সাহাবীকে এমন পাওয়া যাবে না, বাতিলের অনুগৃহিত রিজিকের দানা পানি গ্রহণ করে রোখসোতের চোরা গলি দিয়ে মহিয়ান শাহাদাতের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বেছে নেবে যিল্লাতির জীবন।

❑ †Pnvivq e‡›`Mxi wPý

এদের চেহারায় রয়েছে বন্দেগীর চিহ্ন। আল্লাহ তায়ালা তাই বলেন–

আরবী

"তোমরা চেহারায় দেখবে সিজদার চিহ্ন"। সূরা ফাতাহ : ২৯

যদিও কপালে বিশেষ কোন দাগ এখানে মুখ্য নয়। আসল হলো সিজদার কারণে বন্দেগীর, তাকওয়ার খোদা পুরস্তির নূর তাদের চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। নবীজি (সা) এর সাহাবীদের দিকে প্রথম দৃষ্টিতে একথা বুঝা যেত যে এরা সৃষ্টির সর্বোত্মক চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ। ইংরেজীতে কথা আছে Face is the index of midns. চেহারা মনের সূচিপত্র। জ্যোতি এক নূরানী আভা বিশেষ। কালো মানুষের চেহারায়ও উজ্জ্বল আভা থাকতে পারে। আর সাদা চেহারায়ও অসুন্দরের কালিমা থাকতে পারে। সকল বর্ণের সাহাবীদের চেহারায় ছিল মায়াবী এক ঝলক নূরের আভা। মনের পবিত্রতা, আমলের বিশুদ্ধতা, ঈমানের দৃঢ়তা তাঁদের চেহারায় প্রতিফলিত। তাঁদের দর্শনে মানুষের মন শ্রদ্ধায় নত হত। আর তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্যরা হত অভিভূত।

❑ KiAv‡bi mg‡`i RjPi

কুরআন ও হাদীসে রাসূলের আলোকে তাঁদের বহু বৈশিষ্ট্য থেকে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি আলোচনায় আনতে চাই। আল কুরআনই ছিল তাদের অধ্যয়নের মূল বিষয়। তারা দ্বীনের এ নির্ভেজাল উৎস থেকে হেদায়েত গ্রহণ করেছেন। যে কিতাবের প্রতিটি বাক্য শব্দ এমনকি বর্ণ পর্যন্ত মানবজাতির হেদায়েতের সাথে সম্পর্কিত; যাতে সন্দেহজনক একটি বর্ণ নেই।

আরবী

"এটা পরিপূর্ণ হিদায়েত। যারা আল্লাহ তায়ালার আয়াত থেকে হিদায়েত গ্রহণে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তির যন্ত্রণা।" –সূরা জাসিয়া: ১১

সে যুগে ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার উপস্থিতি পারস্য ও রোমান সভ্যতার বিশাল বিস্তৃতি সত্বেও সাহাবীদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল 'আল কুরআন"। তাঁরা ছিলেন কুরআন সাগরের জলচর। নবীজি (সা) এর দরবারে হযরত উমার (রা) কে তাওরাতের পৃষ্ঠা পড়তে দেখে 'হুজুরে পাক (সা) এর চেহারা মোবারক এর মধ্যে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।"

আরবী

অথচ কুরআনে করিমের উপস্থিতিতে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বুজুর্গের লিখিত কিতাবকে নিয়মিত তিলাওয়াত এর ব্যবস্থা উম্মতের জন্যে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

❑ G‡Ëev‡q ivmj (mv)

রাসূলে পাক এর প্রতি মায়া ও একমাত্র তাঁকেই এত্তেবা করা সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি মুহূর্তে একমাত্র নবীয়ে আকরাম (সা) কে এত্তেবা ও অনুসরণ করেছেন। জীবনের কোন আনন্দ বা কঠিন কোন বেদনা, কোন রোমঞ্চকর ঘটনা বা বিজাতীয় সভ্যতার চাকচিক্য কোন কিছুই রাসূলুল্লাহর (সা) খুলকে আজিম থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরেনি। তাদের শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে রাসূলে পাকই ছিলেন তাঁদের মুর্শিদ। এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আলী (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আমাদের সন্তান, পিতা-মাতা, ধন-সম্পদ এমনকি তৃষ্ণার্ত বেদুইনের কাছে ঠান্ডা পানির চাইতেও বেশী প্রিয়।"

নবীজি (সা)-এর নির্দেশ পালনে তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান। কোন প্রকার ওজর পেশ করা, দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন, সম্ভব ও অসম্ভবের যুক্তি পেশ

করার কোন উদাহরণ কোন সাহাবীদের জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাসূলের (সা) সিদ্ধান্তের সামনে তাঁরা নিজেদের জবান, জ্ঞান, আকল, শক্তি, যোগ্যতা, সহায়-সম্পদ, জীবন-মরণ সব কিছুকে অকাতরে ও বিনয়ের সাথে হাজির করেছেন। বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে পরামর্শ সভায় হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা) বলেন,

আরবী

"ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের মহাসাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।" মুসলিম শরীফ

❑ *nv`x‡mi AvgvbZ`vi*

আলোচনায় এসেছে সাহাবীরা মাসুম ছিলেন না। কিন্তু রাসলের হাদীস বর্ণনার বিষয়ে সমস্ত সাহাবী মাহফুজ ছিলেন। রাসূলে পাকের কোন হাদীস বিকৃত করা বা নিজের কোন কথাকে, কুরআনের ব্যাখ্যাকে রাসূলের হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া এত বড় গুনাহ যে, তাদের নিশ্চিত ঠিকানা জাহান্নাম।

আরবী

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, "যে কেউ কুরআনকে রাসূলের হাদীস ছাড়া নিজের মনগড়া ব্যাখা করে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নেয়।" - তিরমিযী

হাদীসে রাসূলের আমানত খিয়ানত করা, হাদীসের মধ্যে কোন নিজস্ব শব্দ যোজনা করা বা কোন শব্দ ইচ্ছাকৃত বাদ দেয়া, রাসূলের কোন কথাকে গোপন করা অথবা কোন কথাকে হাদীসে রাসূল বলে অভিহিত করা, বিশেষ করে এ ভয়াবহ অপরাধ থেকে সমস্ত সাহাবী সমগ্র জীবন নিজদের হিফাজত করেছেন এ বিষয়ে গোটা উম্মতের ইজমা এই যে,

আরবী

"সমস্ত সাহাবী ছিলেন আদেল"।

এটি প্রমাণিত যে লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সাধারণ একজন সাহাবীও এমন পাওয়া যায়নি যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসের আমানত খেয়ানত করেছেন। কালামে রাসূলের সাথে কিছু যোগ বিয়োগ করেছেন, বিকৃত করেছেন নবীজির বচন। এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহাবীদের হাতে দ্বীন অবিকৃত অবস্থায় ছিল এবং তা দুনিয়ার কাছে পৌঁছে গেছে।

'আজ অক্ষত ও অবিকৃত যে দ্বীনের কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে ফেলার ভয়ানক ও হৃদয় বিদারক আয়োজন শুধু শুরু হয়নি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ ধ্বংসের নেতৃত্ব দিচ্ছে উম্মতের সে নিকৃষ্ট জীবেরা যাদেরকে রাসূল (সা) বলেছেন 'শেরারুল উলামা' গোমরাহ আলেমের দল। এরা দ্বীনের অনুসরণ করে না বরং নতুন নতুন দ্বীন সৃষ্টি করে।

এ বিষয়ে নবীজি (সা) এর সাবধান বাণী স্মরণীয় ঃ

আরবী

"হযরত আয়েশা নবীজি (সা) থেকে বলেন, যে কেউ আমার পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আনবে তার সবটুকু বাতিল যোগ্য।" –বুখারী, মুসলিম

এই বিদয়াতী আলেমেরা আল্লাহ ও রাসূলের ধারণাও বদলিয়ে দিয়েছে। এদের 'আল্লাহ' রাজনীতি অর্থনীতি কোর্ট কাচারী ও সংসদে কি হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না, সেখানে মানুষের আইন সব পরিচালিত হলেও আপত্তির কিছু নেই। বরং সর্বত্র আল্লাহর আইন চালু করার লড়াই সংগ্রামে তারা অসন্তুষ্ট। আর রাসূল সম্বন্ধে ধারণা অনুরূপ ভয়াবহ। এমন এক রাসূল বানাবার চেষ্টা হচ্ছে যিনি মানব নহেন; যদিও সুরতে ইনসান, তিনি মানবের মত জন্মগ্রহণও করেননি তাকে আল্লাহর বান্দা বলা ভয়ানক অপরাধ। মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ, ভাল মন্দ ইত্যাদি আল্লাহ ও রাসূল উভয়ে করেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ সম্পর্কে তার বলার তেমন কিছু নেই। তিনি বেশী রাজি তার জন্ম বৃত্তান্ত মৌলুদ শরীফ আলোচনায়। শুধু তাই নয়– এরা আযান, ইকামত, সালাত সব কিছুতে পরিবর্তন আনতে শুরু করছে, আর জাহেলদের এক দল তাদের বাজার জমিয়ে রেখেছে। ইসলামের দুশমনেরা তাদের জন্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে।

আজকের যুগে কোন সাহাবা যদি আসতেন আর ভন্ডদের এ তামাশা দেখতেন তবে তিনি নেককারদের সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ করতেন, হযরত আবু বকর (রা) মিথ্যা নবীদের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করেছেন।

❑ *gnwmR‡` Øxb*

সাহাবীদের কর্মব্যস্ত জীবন কেটেছে মহানবীর সাহচর্যে ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। তাঁদের পরিচয় তুলে ধরে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন,

আরবী

"আমাদের নবীজির সাহাবী হওয়ার জন্যে ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে বাছাই করা হয়েছে।" বেঁচে থাকার জন্যে তাঁরা কোন না কোন পেশা অবলম্বন করতেন কিন্তু তাদের জীবন লক্ষ্য ছিল দ্বীন। তাদের পারিবারিক ব্যস্ততা, ব্যবসা ও চাকুরী কোন কিছুই তাদের এ লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। এ দ্বীনের প্রয়োজনে তারা প্রতিষ্ঠিত সংসার বিরাণ করেছেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, আপনজনের বিরাগ ভাজন হয়েছেন, জীবনের উপর মরণের ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন, সন্তানদের জনমের তরে ইয়াতীম করেছেন, এত কিছুর পরও দ্বীনের ক্ষতি তারা বরদাশত করেননি। খন্দকের যুদ্ধ চলছে, কনকনে শীতের মধ্যে সাহাবীরা মাটি খনন করছেন, নবীজি (সা) তাদের জন্যে দোয়া করছিলেন আর তারা জবাব দিয়ে বলছিলেন–

আরবী

"আমরা মুহাম্মদ (সা) এর হাতে আমরণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ করার শপথ করেছি।"

রাসূলুল্লাহর ঐ দ্বীন আমাদের কাছে আছে কিন্তু সে দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদ নেই। আমরা আমাদের পরিজন, সংসার ও জীবনের মান বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত। দ্বীন নিয়ে সময় দেয়ার সময় আমাদের নেই। হায়! সে সময় কবে আসবে, যেদনি সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাতার বন্দি হবে সীসা গলানো প্রাচীর সম। উম্মতের খোতাবারা মানুষদেরকে এর জন্যে উদ্বুদ্ধ করবে। আইম্মারা মেহরাব থেকে জিহাদের ডাক দেবে। মাশায়েখরা উম্মতকে জিহাদের উপর বায়াত করাবে। আর শুরু হবে এক লড়াই মানুষের সর্বগ্রাসী আইনের ধ্বজাধারীদের জন্যে জমিন হয়ে উঠবে সংকুচিত।

❑ mvnvex‡`i we‡q D¤§‡Zi `vwqZ

লেখার উপসংহার টানার আগে সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

আরবী

"তাদেরকে চেনো, সম্মান কর ও তাদের জীবন অনুসরণ কর।"

❑ mvnvex‡`i Rxeb Aa¨qb

তাদের সম্পর্কে উম্মতকে জানতে হবে। লক্ষাধিক সাহাবীর জীবন বিস্তৃত ও ব্যাপক। এক একটি জীবন যেন এক একটি জগৎ। উম্মতকে সাহাবীদের রোমাঞ্চকর জীবন সাম্রাজ্যে বিচরণ করতে হবে। আহরণ করতে হবে তা থেকে জীবন চলার পাথেয়।

তাদের জীবন সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরণ করতে হবে মনিমাণিক্য যা আমাদেরকে করবে প্রাচুর্যময় ও সৌন্দর্যমন্ডিত। আমরা আজ যাদের জীবন মহান বলে তুলে ধরি, যাদের জীবন আলোচনার উৎসব করি। সাহাবীদের জীবনের সমুদ্রে এ জীবন নদীগুলো নিজেদের দীনতায় আত্মাহুতি দিয়ে হারিয়ে যাবে।

❑ Zv‡`i cwZ Mfxi m¤§vb

তাদের জীবন আমাদের জন্যে সম্মানের ও মর্যাদার বিষয়। সমস্ত উম্মত যদি খাবার হয় তারা তার মধ্যে লবণ তুল্য। তাদেরকে উঠিয়ে নিলে উম্মতের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। হারিয়ে ফেলবে সকল মূল্য। নবীজি (সা) বলেন–

আরবী

"আমার সাহাবীরা উম্মতের খাবারের মধ্যে লবণতুল্য।"

আমাদের তাদের নাম উচ্চারণ করে রাজি আল্লাহু তায়ালা আনহুম অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহ রাজি হয়ে গেছেন বলতে হয়। নবীদের পর একথাটি আর কার জন্যে বলা যাবে? তাই আমাদের সকল বুজুর্গানে দ্বীনদের উপর তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে আমাদের দুর্ভাগ্যের অবসান হবে না।

❑ Zv‡`i Rxeb AbmiY

তাদের মহান জীবন সকল উম্মতের জীবনের আদর্শ। সকল পয়গাম্বরের উম্মতকে রাসূলে পাকের সাহাবীদের জীবন সৌন্দর্য আল্লাহর অহির মাধ্যমে জানিয়েছেন–

আরবী

"তাদের গুনাবলী রয়েছে তাওরাতে, বিধৃত হয়েছে ইঞ্জিলে।" (ফাতহ)

তাদের জীবন জানা ও সম্মান করার পর যদি আমরা গ্রহণ করতে রাজি না হই হবে তা নিজের উপর জুলুম ছাড়া আর কি হবে? যে জামায়াত সিরাতে মুস্তাকিমের উপর ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি জান্নাতে যেতে চায় তবে নিশ্চিত জান্নাতীদের পথ অনুসরণ করাই তাদের পথ। সাহাবায়ে কিরাম যে মানুষগুলো যারা সকল যুগের জান্নাতীদের অগ্রগামী।

❑ m‡Z¨i gvb`Û

প্রত্যেক জামানার পয়গাম্বরেরা স্বীয় জামানার জন্যে হক না হকের একমাত্র মানদন্ড। সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্যে অহি জরুরী। যেহেতু নবীদের উপর আল্লাহর অহি নাজিল হয় তাই তারা এ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। উম্মতের কেউ এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

আরবী

"নবীদের সাথে রয়েছে কিতাব ও মিজান।" –সূরা হাদীদ : ২৬

অর্থাৎ তাদের উপর নাযিল হয়েছে কিতাব ও হকের মানদন্ড। রাসূলে পাক (সা) এর আগমন সমস্ত পয়গম্বরদের পয়গম্বরী খতম করে দিয়েছেন। তাই রাসূলে পাকের সামনে পূর্বের নবীগণও আর সত্যের মানদন্ড নয়। এ জামানায় তাওরাত, জাবুর ও ইঞ্জিলের নবীগণও যদি দুনিয়ায় আসেন, তাদেরকেও রাসূলে পাকের মানদন্ডে ওজন করা হবে। কারণ পূর্বের মানদন্ড এখন আর মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত নয়।

আরবী

"ঐ আল্লাহর কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন আজ যদি তাওরাতের নবী মূসা (আ) আবির্ভূত হন আর তোমরা যদি তাঁকে সত্যের মানদন্ড হিসেবে অনুসরণ করো, তোমরা হিদায়াতের পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ)

অতএব যেখানে আগের নবীরা পর্যন্ত সত্যের মানদন্ড থাকছে না সেখানে সাহাবীদেরকে সত্যের মানদন্ড ভাবার প্রয়োজন কোথায়? সাহাবায়ে কিরাম বেগুনাহ-মাসুম নহেন, আর তাদের সকলের মান এক রকম নয়, তাদের মধ্যেও রয়েছে মানের তারতম্য, রয়েছে বহু বিষয়ে মত পার্থক্য, তাই তাদেরকে মানদন্ড নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। রাসূলে পাক এর আগমন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের ও আদর্শের একমাত্র মানদন্ড মুহাম্মদ (সা)

আরবী

"নিশ্চয় আপনি একমাত্র মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" – আল কলম : ৩

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানিফার উক্তি সকলের জন্য স্মরণযোগ্য ঃ

আরবী

"আমরা যখন রাসূলে করিম (সা) থেকে বর্ণিত কোন হাদীস পাব বিনা বাক্যে সেটি গ্রহণ করব তা আমাদের মাথা ও চোখের উপর। আর যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে কোন হাদীস পাব সেটিকে রাসূলের (সা) কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রহণ করব। আর যখন তাবেয়ীনদের (রা) কাছ থেকে হাদীস পাব সে ব্যাপারে কথা হল তারাও মানুষ আমরাও মানুষ।"

তবে হ্যাঁ সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করলে অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) এর মানদন্ডে যাচাই করলে সাহাবীদেরকে সম্পূর্ণ খাঁটি হিসেবে পাওয়া যাবে। তাঁরা যদিও সত্যের কষ্টি পাথর নহেন তবে সত্যের কষ্টি পাথরের যাচাইয়ে নির্ভেজাল খাঁটি সোনা বলে প্রমাণিত। কিন্তু একটি খাঁটি সোনার পিন্ড আর একটি সোনার পিন্ড খাঁটি কি অখাঁটি বা কতটুকু খাঁটি তা যাচাই এর মানদন্ড নয়। অনুরূপভাবে সাহাবীরা একে অপরের মানদন্ড বা উম্মতের জন্যে সত্যের চূড়ান্ত মানদন্ড নয়।

মুহাম্মদ (সা) এর আদর্শ পরিপূর্ণ ও যথার্থভাবে গ্রহণ ও তাঁকে হুবহু অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবীরা সমগ্র মানবতার জন্যে কিয়ামত অবধি সঠিক মানদন্ড। রাসূল পাকের সুন্নাতের সঠিক ব্যাখ্যা ও সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে উম্মতের তামাম বিতর্কের একমাত্র ফায়সালা সাহাবায়ে কিরাম (রা)। রাসূল (সা) কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করলে উম্মতেরা সঠিকভাবে রাসূলের অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে। যাঁরা রাসূলে পাকের দরবারে ছিলেন, যাদের সামনে সাইয়্যেদেনা জিবরাইল হাজির হয়েছেন, যাদের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলের (সা) দ্বীনি জিন্দেগীর সব কিছুতে যারা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত নবীজি (সা) এর আদর্শ সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকবাবে গ্রহণ করার জন্যে সাহাবীদের জীবনই যে একমাত্র 'মেয়ার' সে বিষয়ে নবীজি (সা) হাদীস স্মরণযোগ্য।

আরবী

"রাসূলে পাক (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, নাজাতপ্রাপ্ত কারা? উত্তরে মহানবী (সা) বললেন, সে দল আমি ও আমার সাহাবীদের অনুসারী।"।

❑ *Dcmsnvi*

একটি বিস্তৃত ও ব্যাপক বিষয়ে আলোচনা শুরু হলেও একটি নিবন্ধে এর পরিসমাপ্তি সম্ভব নহে। এ বিষয়ে অনেক বলা ও লিখা প্রয়োজন। মুসলিম বিশ্ব আজ রক্তাক্ত, শৃংখলিত, বেদনাক্লিষ্ট, পরাভূত ও হতাশার তিমিরে নিমজ্জিত। এত বিশাল সাম্রাজ্য, এত বিপুল জনগোষ্ঠী, এত অপরিমেয় প্রাচুর্য ও অঢেল সম্পদ এমনকি পরমাণু শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও মুসলিম দুনিয়ার অমানিশার ঘোর আজো কাটেনি। জানিনে রাত পোহাবার আর কত দেরি!

আমাদের বস্তি বিরান হয়ে যাচ্ছে, উদ্বাস্তুরা সকলেই আমাদের আপনজন, আমাদের শিশুরা বিনা চিকিৎসায় অকাতরে মরছে, আমাদের মাদের সতিত্ব রক্ষার চিৎকার কেউ শুনছে না। আমাদের বয়ে যাওয়া রক্তের স্রোত সৃষ্টি করছে সাগরের। আমাদের উপর চলছে অবরোধ। আমাদের আলমিরায় কি আছে দস্যুদের খুলে দেখাতে হবে। আমাদের সচেতন ভাইদেরকে হায়েনাদের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা তারা সব কিছুকে গুঁড়িয়ে দেবে। হায়! আমরা যেন মানুষ নই! এর চাইতেও বেদনাকর এই যে, মুসলিম দুনিয়ার শাসকদের মাথাটাই সাম্রাজ্যবাদীরা কিনে নিয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, নগ্ন নারীর স্পর্শ, আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও খেতাবের বিনিময়ে। এ পরাশক্তির পদলেহী মুসলিম দুনিয়ার আমীরদের তারা ব্যবহার করছে মুসলমানদের পুনঃজাগরণের আন্দোলন থামিয়ে দিতে। মুসলমানেরা আজ নিজ দেশেও ভিনদেশী। আলজেরিয়া, মিসর, সিরিয়া, সৌদি আরব ও বাংলাদেশের কারাগারে আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের নির্যাতন চলছে। সমস্ত Media কে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ দালালদের বহাল রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটিও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

প্রচলিত ব্যবস্থায় তাদের NGO Network এর মাধ্যমে অর্থ, অস্ত্র, গণমাধ্যম সবকিছুকে ব্যবহার করে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, এতে নির্বাচনের বৃক্ষ থাকবে কোন ফল ধরবে না। সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সন্তোষ-জনক ইত্যাদি বিরক্তিকর শব্দের গর্জন থাকবে কিন্তু এক কাতরা বর্ষণ হবে না।

আর মুসলিম বিশ্বের গোটা জনশক্তিকে যেহেতু কেনা যাবে না তাই সেখানে তারা ছিটিয়ে দিয়েছে 'ইসমতে আম্বিয়া', 'শানে গাউসিয়া', 'নারায়ে রিসালত' ও 'শানে সাহাবা' ইত্যকার জনদুর্বোধ্য কতহুলো শব্দ যা পেট্রোলের চেয়েও ভয়াবহ দাহ্য পদার্থ। আর এরা ধরিয়ে দিয়েছে অনৈক্যের দাউ দাউ আগুন উম্মতের সব কিছুকেই জ্বলে পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে।

এ সর্বগ্রাসী ভয়াবহতা মোকাবিলায় কোন শেখ, বুজুর্গ, আকাবের বা মুরুব্বি কল্পনাই শুধু করা যাবে ফল হবে না। এক্ষেত্রে রাহমাতুল্লিল আলামীনই একমাত্র সমাধান। যার জন্যে সালেহীন এক দল মানুষ এগিয়ে আসতে হবে। যাদের মধ্যে সাহাবায়ে মুহাম্মদ (সা) এর ঈমানের দৃঢ়তা, আপোষহীনতা, মানবতার প্রতি মমতাবোধ, হকের জন্যে সর্বস্ব কুরবানীর জজবা সহ মুস্তাফা (সা) এর পূর্ণাঙ্গ ইত্তেবা ও শেষ রাতের আহাজারী থাকবে। শতাব্দীর ক্রান্তি লগ্নে মানব রচিত সব মতাদর্শ যখন প্রত্যাখ্যাত, জরাগ্রস্ত এ দুনিয়াকে সঞ্জিবনী দিতে, সৃষ্টি করতে আর একটি সৃজনশীল বিশ্ব, পৃথিবী অপেক্ষা করছে সাহাবীদের চরিত্র সমন্বিত একটি সুসংগঠিত জামায়াতের। আর্তমানবতা প্রতীক্ষায় দিন গুনছে তাদের জন্য। তাঁদের আগমন যত দ্রুত ও নিশ্চিত হবে পৃথিবীও তত দ্রুত একটি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে বেঁচে যাবে। সমগ্র দুনিয়াব্যাপী তাঁদের আগমনের শ্লোগান শুনা যাচ্ছে। চারিদিকে শত্রুরা তাঁদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে তাদের উপর চলছে ইতিহাসের জঘন্যতম নির্যাতন। এত কিছুর পরও তাঁরা এগিয়ে চলছে বাধার হিমালয় ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলছে রক্তের সাগর পিছনে রেখে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে সেই মজলুমদের কাফেলায় সম্পৃক্ত করেন।

mvnvev‡q wKivg (iv) Gi Rxeb t_‡K Abcg `óvš

❑ প্রিয়পাঠক! সাহাবীদের মহান জীবনের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা আলোচনার পর এবার আমি তাঁদের জীবনের থেকে কিছু অনুপম দৃষ্টান্ত আলোচনায় আনতে চাই। যদিও সাহাবীদের সংখ্যা লাখের উপর তদোপরি তাদের প্রত্যেকের

জীবন পুরোটাই আপন মহিমায় ভাস্বর। এক এক জনের জীবনের মধ্যে রয়েছে শত শত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সবকিছু নিয়ে লিখতে হলে বিশ্ব কোষের বহু খন্ড রচনা করতে হবে। এ নিবন্ধে আমি লাখ সাহাবীর লাখ লাখ জীবনের উদাহরণ থেকে মাত্র কয়েকজনের কয়েকটি দৃষ্টান্তই উপস্থাপন করতে চাই। শুধু এ আশা নিয়ে সাহাবীদের জীবন শুধু ভক্তি শ্রদ্ধার পরিমন্ডলে মর্যাদার পবিত্র আসনে সীমিত থাকার বিষয় নয় বরং তাদের জীবন মানুষের জন্যে গ্রহণ করার এক অনুপম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বিপুল সমাহার। শুধু আজকের জন্যে নয়, বরং আগামী কালের মানুষের জন্যেও তাদের জীবনে রয়েছে জীবন চলার আলো।

❑ এঁদের মধ্য থেকে মাত্র দশজনের জীবনকে সামনে আনতে চাই যাদেরকে রাসূলে আকরাম (সা) সোয়া লক্ষ সাহাবীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিয়েছেন– 'আশারাহে মুবাশশারাহ' বলে তাঁরা দুনিয়ায় খ্যাত। তাঁরা সকল সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যমনি। তাঁদের নাম জানিয়ে দিয়ে রাসূল আকরাম (সা) বলেন–

আরবী

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন– "আবু বকর বেহেস্তবাসী, উমর ফারুক বেহেস্তবাসী, উসমান বেহেস্তবাসী, আলী বেহেস্তবাসী, তালহা বেহেস্তবাসী, যুবায়ের বেহেস্ত বাসী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ বেহেস্তবাসী, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বেহেস্তবাসী, সাঈদ ইবনে যায়িদ বেহেস্তবাসী এবং আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ বেহেস্তবাসী।" – তিরমিযী, ইবনে মাজা

আমি হাদীসে বর্ণনার ক্রমানুসারে এক এক করে তাঁদের আলোচনায় যেতে চাই। তাও প্রতিজনের জীবন থেকে একটি বিষয়ে দু' একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

এদের জীবন এমন যে রাসূলুল্লাহ (সা) এ দশজনকে বেহেস্তী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

nhiZ Ave eKi (iv) t
Bmjvgx weavb cwZôvq wPi Av‡cvInxb

❑ নবীজি (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ের কঠিন দিনগুলোতে কে আপনার সাহায্যকারী ছিলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন,.....

"একজন আযাদ একজন গোলাম"। আর আযাদ ব্যক্তিটি সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রা)। নবীজি (সা) বলেন, আবু বকর (রা) আমার উম্মতের উপর আল্লাহ তায়ালার করুণা"।

তিনি অত্যন্ত কোমল ও ভদ্র ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বন্ধু ছিলেন। একদিকে তিনি ছিলেন সীমাহীন কোমল আবার ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তিনি ছিলেন সীমাহীন কঠোর।

❑ রাসূল কারীম (সা) যে দিন ইন্তিকাল করেন সে দিনটি ছিল উম্মতে মুহাম্মদীর জীবনে সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ দিন। সর্বগ্রাসী বিপর্যয় যেন সব কিছুকে ডেকে নিল। সমস্ত সাহাবীরা ছিলেন শোকে বিহবল ও দিশেহারা। হযরত উমরের (রা) মত কঠিন ব্যক্তিত্বও নাংগা তরবারী হাতে নিয়ে ঘোষণা দিচ্ছিলেন– "মুহাম্মদ (সা) এর ইন্তিকাল হয়েছে এই কথাটি যে বলবে তাকে কতল করা হবে।" এমনি পরিস্থিতিতে রাসূলের লাশ মুবরাককে চুমা খেলেন আবু বকর (রা) আর কুরআনের আয়াতটি পড়লেন–

আরবী

"নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাদেরকেও মরতে হবে। তারপর তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের দরবারে সব মামলাই পেশ করবে।" – যুমার : ৩০-৩১

অতঃপর তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়ালেন আর দিক নির্দেশনা দিয়ে যে বক্তব্য রাখলেন তার দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই। আবু বকরের কলিজা রাসূলের বিচ্ছেদে সবচেয়ে বেশী আহত ছিল। কিন্তু সমস্ত বেদনার আগ্নেয়গিরি বুকে চেপে ধরে তিনি বললেন–

আরবী

"হে মুসলমানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা) এর পূজা কর তারা জেনে নাও মুহাম্মদ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। আর তোমরা যারা আল্লাহর বন্দেগী কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ তায়ালা কখনও মরবেনা। সাবধান! মুহাম্মদ (সা) রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পূর্বে অনেক নবী ও

রাসূলগণের আগমন হয়েছিল। তিনি যদি ইন্তিকাল করেন বা তাকে যদি কেউ শহীদ করে দেয় তবে কি তোমরা দ্বীন থেকে সরে দাঁড়াবে? আর যারা ইসলাম থেকে সরে যাবে তারা আল্লাহর দ্বীনের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ কৃতজ্ঞতাকারীদের বিনিময় দান করবেন।" – আলে ইমরান : ১৪৪

আবু বকর (রা) এর কঠোর বক্তব্যের পর জনগণের অস্থিরতা প্রশমিত হল। হযরত উমর (রা) এর নাংগা তরবারী হাত থেকে ঝরে গেল। হযরত আবু বকর (রা) এর হস্ত চুম্বন করে তিনি বললেন, 'কুরআনের এ আয়াত আমার স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছে আপনার উপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ হচ্ছে।'

❑ খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় বিশ হাজারেরও বেশী সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে হযরত আবু বকর প্রথম যে রাষ্ট্রনায়ক সূলভ বক্তব্য দিয়েছিলেন সকল যুগের রাষ্ট্র প্রধানের জন্যে তা এক অমূল্য সম্পদ। সে বক্তব্য প্রমাণ করে তিনি নীতির প্রতি কত আপোষহীন।

নবীজি (সা) এর মসজিদে নবীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সিদ্দীকে আকবর (রা) খলীফা হিসেবে ও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বলেন, "হে জনমন্ডলী আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আল্লাহর কসম, আমি চেয়েছিলাম আপনাদের মধ্যে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসূলুল্লাহর মত হোক তাহলে আমাকে সে মানে পৌঁছার ক্ষেত্রে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল ও মাসুম। আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি আপনাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। আমি ভাল কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবেন। আর ভুল করলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। মনে রাখবেন সততা একটি আমানত ও মিথ্যা একটি খেয়ানত। আল্লাহর কসম! আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে সবল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ আমি তার ন্যায্য অধিকার তাকে দিতে পারি। আর আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না অন্যের অধিকার আমি তার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি।

"হে লোক সকল! জিহাদকে অবহেলা করা যাবে না। আল্লাহর রাহে জিহাদ থেকে যে জাতি বিরত থাকে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। আর যখন কোন জাতির মধ্যে পাপাচার ব্যাপক রূপ ধারন করে তখন সে জাতির মধ্যে আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয়।

ভাইসব! যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ আপনারাও আমর নির্দেশ পালন করবেন। আর যখন আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পরিহার করি আমার আদেশ পালন আপনাদের উপর আর জরুরী থাকবে না।

এখন নামাযের সময় হয়েছে সকলে তৈরী হোন। আল্লাহ পাক আমদের প্রতি রহম করুন।" আমীন। – তবকাতে ইবনে সাদ

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) এ ভাষণ সকল রাষ্ট্রনায়ক ও দায়িত্ব পালনের জন্য একটি স্বর্ণের আঁখরে লেখা অনন্য দলীল।

❑ তাঁর চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তার আর একটি নজীরবিহীন দলিল হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা) এর বাহিনী যুদ্ধে প্রেরণের নির্দেশ। রাসূল (সা) হযরত উসামাকে সেনাপতি করে রোমানদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে শাম দেশে অভিযানের নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনী মদীনা ত্যাগের পূর্বেই নবীয়ে করিম (সা) ইন্তিকাল করেন। প্রথম খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের এক সপ্তাহ পরই সার্বিক বিপর্যয় বিবেচনা করে এ অভিযান চালানো সে সময় ঠিক হবে কিনা আর হলেও ১৭ বছরের বয়স্ক উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাপতির পদে বহাল রাখা ঠিক হবে কিনা এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠল। হযরত উমার (রা), আবু ওবায়দা (রা) হযরত খালিদের নেতৃত্বে বাহিনী পাঠাবার পরামর্শ দেন। হযরত আলী ও উমর (রা) এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ আপাতত! অভিযান প্রয়োজনে স্থগিত রাখার পরামর্শও দেন। আর যদি সৈন্য পাঠাতে হয় তবে সেনাপতি পরিবর্তন করা জরুরী। হযরত আবু বকর (রা) রাগে ফেটে পড়লেন। হযরত উমরের দাড়ি মুষ্ঠিবদ্ধ করে ধরে চিৎকার করে বললেন, "হে উমর! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তুমি কঠোর ছিলে আজ তুমি বুজদেল হয়ে পড়ছ!"

"খলীফাতুল মুসলেমিন বললেন, "আমি কি ঐ ব্যক্তির হাত থেকে ঝান্ডা কেড়ে নেব, রাসূলুল্লাহ (সা) যার হাতে ঝান্ডা তুলে দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আমার লাশ যদি পশু-পাখি ঠোকরে খায় তবু রাসূলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমি এক চুল পিছপা হবনা। তোমরা যদি উসামা বিন যায়েদ (রা) এর নেতৃত্বে যুদ্ধে বের না হও তবে খেলাফতের দায়িত্ব! তোমাদের উপর রইল আমি যুদ্ধে রওয়ানা হলাম"। সকলে নিরব হয়ে গেলেন। উসামা বিন যায়িদের

(রা) বাহিনী রওয়ানা হলে খলীফা আবু বকর (রা) সেনাপতির ঘোড়ার সাথে পায়ে হেঁটে সামনে চললেন– ও হযরত উমর (রা) কে নতুন খলীফাকে পরামর্শ দানের প্রয়োজনে রেখে যাওয়ার জন্যে বললেন। হযরত উসামা (রা) খলীফার আবেদন মঞ্জুর করে হযরত উমার (রা) কে তার বাহিনী থেকে মদীনায় রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেন। সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) এর সিদ্ধান্ত ও তার নিয়োগকৃত কিশোর সেনাপতির প্রতি সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রা) এর শ্রদ্ধাবোধ ও আপোষহীনতা সমস্ত উম্মতের জন্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত। অতঃপর খলীফা আবু বকর (রা) উসামার (রা) বাহিনীকে নসীহত করে বললেন, "কারো সাথে ওয়াদা খেলাফ করবেনা। স্বীয় অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র রাখবে। সাবধান! লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন ও বিকৃত করা হারাম। শিশু-বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। ফলদার ও ছায়াদার বৃক্ষ ধ্বংস করবেনা। দুনিয়াত্যাগী রাহেব ও সৈন্নাসীদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। যুদ্ধে বাধাদানকারী রোমক সৈন্যদের হত্যা করবে। তোমরা এগিয়ে যাও– আল্লাহ তোমাদের সহায়।" – তারীখুল খোলফা, তবারী

মাত্র ৪০ দিনের মাথায় হযরত উসামার (রা) বাহিনী বিজয়ী হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

❑ হযরত আবু বকর (রা) এর খিলাফতের শুরুতে নানা সমস্যা একসাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের বিরাট শূন্যতাকে পুঁজি করে সাম্রাজ্যবাদী রোমান ও পারস্য আবার ফনা বিস্তার করে, নিজেদের মধ্যে মুনাফিকেরা সৃষ্টি করে হাজার সমস্যা। মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার গোষ্ঠী প্রচন্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "খিলাফতের প্রথম অবস্থায় আমার আব্বার উপর সমস্যার প্রচন্ড তুফান বয়ে যাচ্ছিল। যা এতই ভারি ও জটিল ছিল যে তা যদি কোন পাহাড়ের উপর রাখা হতো তবে পাহাড় জমিনের সাথে মিশে যেতো।"।

হযরত আবু বকরের খিলাফতের সূচনাতে– বনু আসাদ, বনু ফাজরা, বনু গাতফান, বনু আগলাবা, বনু আবাস এবং জুবইয়ান ইত্যাদি শক্তিশালী গোত্রসমূহ একযোগে ঘোষণা করল তারা ইসলামের সব অনুশাসন মেনে চলবে তবে বায়তুল মালে যাকাত দেবে না। একসাথে এতগুলো প্রভাবশালী গোত্রের বিদ্রোহ মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। খলীফাতু রাসূলিল্লাহ (সা) হযরত আবু বকর (রা) জরুরী মজলিশ-ই-শুরার অধিবেশন আহ্বান করেন। সকল সদস্য ও আশারা মুবাশশারাহ একযোগে খলীফাকে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকা ও বিদ্রোহী করমের সাথে আপোষ এর ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করলে হযরত উমর (রা) খলীফাকে বলেন, "হে রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। এই বিদ্রোহী গোত্রের সাথে আপনি আপোষ করুন। শান্তি স্থাপন করুন ও তাদের প্রতি সদয় হোন।" সাইয়েদেনা আবু বকর সিদ্দীক (রা) সকলের সম্মিলিত রায়কে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন–

আরবী

"আল্লাহর শপথ! যারা সালাত ও যাকাতকে আলাদা করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। নিশ্চয় যাকাত হচ্ছে মালের মধ্যে আল্লাহর অধিকার। রাসূলুল্লাহর (সা) এর সময়ে যারা যাকাতের উট যে রশিতে বেঁধে আনা হত আজ উট নয় যাকাতের উটের সে রশির জন্য আমি লড়াই করব। আজ আমার সামনে আকাশ, জমিন, পাহাড়, পর্বত সমগ্র সৃষ্টিও যদি পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় আল্লাহর কসম! আমি একা যুদ্ধ থেকে পিছপা হব না।" খলীফার এ দৃঢ় ঘোষণার পর অপর কেউ ভিন্নমত পোষণ করার সাহস করেনি। অতঃপর বায়তুল মালে যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হলো এবং বায়তুল মালে যাকাত দিতে বাধ্য করা হলো। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সেদিন আবু বকর (রা) যদি এ কঠিন সিদ্ধান্ত না নিতেন তবে ইসলামের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত টিকে থাকত কিনা সন্দেহ। হযরত উমর (রা) বলেন,

আরবী

"আহ আমার মনে হচ্ছে সেদিন- যেন আবু বকরকে– আল্লাহ তায়ালা ইলহাম করে দিয়েছিলেন তাঁর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত-বিলকুল সঠিক ছিল"– বুখারী, মুসলিম

ইসলামের মূল সুর হচ্ছে শরিয়তের বিধানের সাথে আপোষকামীতা নয় বরং আপোষহীনতা। মুসলিম উম্মাহ আজ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কুফরীর সাথে, পরিস্থিতির সাথে, আপাত প্রয়োজনের সঙ্গে, যুগের দাবীর জবাবে অথবা ভয় ভীতির কারণে আল্লাহ তায়ালার বিধান ও সুন্নতে নবী (সা) এর সাথে আপোষ এর নামে বিকৃতি চলছে। ইসলামের সাথে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কঠোর অনুশীলন ও অনুসরণের পরিবর্তে ইসলামকে বাধ্য করা হচ্ছে আমাদের সাথে আপোষ করে চলার জন্যে। মুসলমানরা ইসলামের কাছে

আত্মসমর্পণ না করে এর বিপরীতে ইসলামকে তথাকথিত মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দীক (রা) যে চরম কঠোরতা ও আপোষহীন মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন তা সমস্ত সাহাবীদেরকে আপোষকামীতা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছে; হিফাজত করেছিলেন ইসলামকে এর বিকৃতির সূচনা লগ্নে। আজ পতনের যুগের মুসলমানদেরকে সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও বিকৃতির থেকে মুক্তি দিতে ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকরের দৃঢ়তা ও কঠোরতার আর কোন বিকল্প নেই ও হতে পারে না।

nhiZ Dgi dvi"K (iv) t
Avjvni f‡q m`v K¤úgvb

❑ ইসলামের ইতিহাসে যে ব্যক্তিটি উজ্জ্বল এক প্রদীপ হয়ে জ্বলছে, ইসলামের দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে যার সাথে কারো তুলনা নেই তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)। যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

আরবী

"আমার পরে যদি নবুওয়ত থাকত তাহলে উমর তোমাদের মধ্যে নবী হতো।" – তিরমিযী

যাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের সময় আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেছিলেন, "হে লোক সকল! আমি আমার বংশ থেকে কাকেও খিলাফতের দায়িত্ব দিচ্ছি না, আমি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষের উপর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি।" হযরত উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছিলেন, "আমি খিলাফত চাই না। সিদ্দীকে আকবর (রা) জবাবে বলেছিলেন, "হে উমর! তুমি খিলাফত চাও না কিন্তু খিলাফত তোমাকে চায়।"

মুসলমান হওয়ার পর হযরত উমরের কঠোর জীবনে আসছিল আমূল পরিবর্তন। তার গোটা জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ড উম্মতের জন্যে হয়ে উঠে বেনজীর দৃষ্টান্তের এক অখণ্ড সমষ্টি।

আমি হযরত উমরের জীবন থেকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে জীবন অতিবাহিত করার দু-চারটি উদাহরণ তুলে ধরব মাত্র।

❑ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে হযরত উমর এতই ক্রন্দন করতেন যে চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে যেতো, মাঝে মাঝে তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর গন্ডদেশে দুইটি কালো কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর জীবনীকারেরা বলেছেন, "তাঁর কপোলে চোখে দু' টি কালো দাগ পড়েছিল।"

মাঝে মাঝে একাকী বসে বসে তিনি কাঁদতেন, একখানি তৃণখণ্ড হাতে নিয়ে বলতেন,

আরবী

"আহা! উমরের মা উমরকে কেন জন্ম দিয়েছিলে? আমি যদি মানুষ না হয়ে একটি তৃণ হতাম কত ভাল হতো– আমাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে জওয়াব দিতে হতো না।"

❑ ১লা শাওয়াল। ঈদুল ফিতরের আনন্দ চারদিকে। কোলাকুলি হাসি ও আনন্দ মিছিল আর ফিরনী, পায়েশের ছড়াছড়ি। ঈদের নামাজান্তে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমরকে (রা) দেখা যাচ্ছে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি খুঁজতে খুঁজতে তার বাড়ীতে গেলাম। ভিতর থেকে বদ্ধ একটি কক্ষ থেকে খলীফার ক্রন্দনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমি বদ্ধ দরজায় করাঘাত করছিলাম। তিনি দরজা খুলে দিলে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আজকে ঈদের খুশীর দিনে আপনি এভাবে কেন কাঁদছেন? কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? খলীফা বললেন, "যারা খুশীর খবর পেয়েছে তাদেরকে খুশী করতে দাও, আবার তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। "হে আবু হুরায়রা! রমযানের বদৌলতে যার জীবন থেকে গুনাহের কালিমা মুছে গেছে তার জন্যে আজ আনন্দের দিন। আর রমযান শরীফ বিদায় হওয়ার পরও যার জীবন পাপমুক্ত হতে পারেনি তার জন্যে আজ ক্রন্দন করার দিন। তিনি বলেন,

আরবী

"আমি জানিনে, আমি কি আল্লাহর মকবুল বান্দাদের অন্তর্গত না কি আমি বিতাড়িতদের অন্তর্ভুক্ত?"

আল্লাহর ভয় কিভাবে হযরত উমরকে অস্থির করে দিয়েছিল তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

❑ চলার পথে হযরত উমরের সাথে এক বৃদ্ধার দেখা হল। কথা প্রসঙ্গে উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন। আমীরুল মুমিনীন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? বৃদ্ধা উমর (রা) কে চিনতেন না। সে নির্বিঘ্নে বলল, সে মোটেও ভাল মানুষ নয়। আমি অতি কষ্টে আছি খলীফা আমার কোন খবর নেয়নি। উমর (রা) বললেন, "তুমি খলীফাকে তোমার অবস্থার কথা কেন বলনি? তাঁকে না জানালে তিনি কি করে জানবেন?" বৃদ্ধা মহিলাটি বলল, 'এটি খলীফার দায়িত্ব প্রজাদের খোঁজ খবর রাখা"। উমর (রা) বললেন, "হে মা! কি পরিমাণ অর্থ পেলে তোমার দুঃখ ঘুচবে আর তুমি খলীফাকে ক্ষমা করে দেবে"? সে সময় হযরত আলী (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সে পথ দিয়ে যেতে খলীফাকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে সম্বোধন করে সালাম দিলেন। বৃদ্ধা রমনীটি ভয়ে কেঁপে উঠল। হযরত উমর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ৫০০ শত স্বর্ণমুদ্রা তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খলীফার বিরুদ্ধে তোমার আর কোন অভিযোগ আছে কিনা? তিনি বললেন, 'না'। হযরত উমর (রা) এক খন্ড চামড়ার উপর কথাটি লিখিয়ে নিলেন। 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমরের বিরুদ্ধে আমার আর কোন অভিযোগ নেই।" হযরত আলী সাক্ষীরূপে তাতে স্বাক্ষর করলেন।

এ ঘটনা সকল মানুষের জন্যে বিশেষ করে দায়িত্বশীল লোকদের জন্যে দায়িত্বানুভূতির এক চিরন্তন আদর্শ।

❑ ১৮ হিজরী সালে মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। সে সময় একদিনের জন্যেও হযরত উমর গোস্ত-রুটি আহার করেননি। একদিন তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম একটি সিদ্ধ ডিম ও রুটি খেতে দিলে তিনি বললেন, "আমাকে একটি তরকারি সহ রুটি খেতে দাও। একটি ডিমে সাদা ও হলুদ দুইটি তরকারি আছে। আমার প্রজাকুল একটি তরকারি দিয়ে আহার করতে পারছে না।"

'ফতহুল বুলদানে' উল্লেখ রয়েছে, দুর্ভিক্ষে যে সমস্ত লোক অনহারে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে খলীফা মনে করতেন তাদের জন্যে খলীফাকে আল্লাহর কাছে দায়ী হতে হবে। রাতের শেষে কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করতেন, "হে আল্লাহ! আমার পাপ ও অযোগ্যতার দরুণ রাসূলের উম্মতকে ধ্বংস করে দিও না।"

হে প্রভু! হযরত উমরের (রা) এ অনুভূতি গোটা উম্মতে মুহাম্মদীকে তুমি বন্টন করে দাও।

❑ খলিফার সামনে সাধারণ আটার রুটি, যয়তুনের তেল, সিরকা ও লবণ দেখার পর হযরত হাফস ইবনে আবিল আস (রা) খলীফাকে আরও একটু উন্নত আহার করার অনুরোধ করলে তিনি বলেন, "হে আবিল আস! আল্লাহ তায়ালা আমাকে এর চেয়ে ভাল আহার্য গ্রহণের সামর্থ দিয়েছেন কিন্তু আমি কিয়ামতের শাস্তির ভয়ে তা আহার করতে পারছিনা।"

❑ ঘর্মাক্ত কলেবরে তপ্ত মরুতে খলীফা কি যেন খুঁজছেন, "গরমের মধ্যে আপনি কি খুঁজতেছেন"? হযরত উমর (রা) বলেন, "হে আলী! বায়তুল মালের উটের হিসাব মিলছে না। আমি উট তালাশ করছি।" হযরত আলী বলেন, "উট খোঁজার জন্যে কি আর কেউ নেই?" "তবে হ্যাঁ, খলীফা বললেন, মুসলমানদের বায়তুল মালের উটের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা উমরকে জিজ্ঞাসা করবে।"

❑ নিশি রজনীতে প্রজাকুলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে তিনি মদীনার গলিতে-গলিতে হাঁটতেন আর বলতেন "হে মদীনার অধিবাসীগণ! তোমরা আরামে ঘুমাচ্ছ অথচ আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছ না, খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে অস্থির করে দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর খিলাফতের দায়িত্বকালে আমি রাতে বিছানায় ঘুমিয়েছি কিনা।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত উমরের খিদমতে আমার মাত্র ৩ ঘন্টা অবস্থান করা, এক বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে আমি উত্তম মনে করি।

আল্লাহকে ভয় করে জিন্দেগী অতিবাহিত করার মধ্যে রয়েছে সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি। এই খোদাভীতি হচ্ছে জীবন তরীর নোংগর। সমাজের সমস্ত ভাংগন বিপর্যয়ের মূল কারণ নির্ভয় ও জবাবদিহির অনুভূতিহীন নেতৃত্ব। খোদাভীতি হযরত উমরের (রা) ব্যক্তি জীবনকে এত মহান ও গরিয়ান করেছিল যে এর সাথে সমস্ত দুনিয়াটাও যেন ছিল মূল্যহীন। তাঁর তাকওয়া ভিত্তিক শাসন পরিচালনা পৃথিবীর শেষ দিন অবধির জন্যে এক জ্বলন্ত ও অনুপম দৃষ্টান্ত। আজ পৃথিবী যখন অশান্তির আগুনে জ্বলছে বিপর্যস্ত মানবতার আর্ত চিৎকার, দাম্ভিক, অহংকারী ও পাশবিক শক্তির অধিকারী পরাশক্তির বোমার লেলিহান আগুনে হাজার হাজার বছরের সভ্যতার অস্তিত্বকে জ্বলে পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে; বুলডোজার এর নিষ্ঠুর চাকার নিচে মিশে যাচ্ছে বনি আদমের মাথাগুজার আশ্রয়, বিরান হয়ে যাচ্ছে শত কোটি জীবন আর

জীবনের হাজারো আয়োজন। যুদ্ধ বন্দীদের অনাহারে রেখে রাসূলুল্লাহ (সা) আহার করেনি। শক্ত বাঁধনকে সহজ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ সভ্যতার মিথ্যা দাবীদারদের আচরণ কতইনা অসভ্য ও বীভৎস। গোয়েন্তা নামোবের বন্দীশিবিরে শিকল পরিহিত, চোখ বাঁধা মানুষগুলো রাখা হয়েছে অনাহারে, অত্যাচারের পর অত্যাচারে জর্জরিত, রক্তাক্ত ও অবসন্ন দেহ থেকে সভ্যতার শেষ আবরণটুকুও খুলে নেয়া হয়েছে। ঐ বিবস্ত্র মৃত প্রায় মানবতার উপর চলছে বলৎকার, তৃষ্ণার্তদের পান করতে দিচ্ছে আমেরিকা ও তাদের দোসর ইতর ও বর্বর সৈন্যদের প্রস্রাব! মানুষ ত নয়, পশুদের মধ্যেও এর কোন নজির নেই।

❑ অপরদিকে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। মুসলমানেরা জেরুজালেম নগরী অবরোধ করে রেখেছে। সেনাপতি আমর ইবনুল আস (রা) এর নেতৃত্বে মাসের পর মাস চলছে অবরোধ। অবশেষে খৃস্টান নেতৃবৃন্দ জানালো, 'হযরত উমর (রা) যদি জেরুজালেম নগরীতে আসেন তবে বিনারক্তপাতে এ পবিত্র নগরীর চাবি তুলে দেয়া হবে তাঁর হাতে। নতুবা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য।"

আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশ রক্তপাত করা যাবে না, তাদের দূর্গে আঘাত হানা যাবে না, খলীফা নিজেই জেরুজালেম আসবেন। অর্ধ পৃথিবীর শাসক একটি গোলাম, সামান্য খাবার ও পানির সাথে উটের পৃষ্ঠে আরোহন করে রওয়ানা হলেন জেরুজালেমের পথে। খরতপ্ত মরু উটের লাগাম হাতে চলছে গোলাম। ঘাম ঝরছে দরদর করে। সমগ্র পৃথিবী যে উমরের ভয়ে কম্পমান সে উমর আল্লাহর ভয়ে কাঁপছে থর থর করে। গোলামকে ডেকে বললেন-

"আসলাম! তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, আমাকে কিছুক্ষণ উটের রশি হাতে চলতে দাও। আর তুমি উটের পিঠে বস।" গোলাম বললেন, "অসম্ভব, এটা কখনও হতে পারে না।" খলীফা বললেন, 'না, সারাপথ প্রচন্ড গরমের মধ্যে তুমি উট টেনে চলবে এটা অমানবিক। আমি এ জুলুমের জন্যে আল্লাহকে জবাব দিতে পারব না।" খলীফা নির্দেশ দিয়ে গোলামকে উটের পিঠে চড়িয়ে তিনি উটের রশি হাতে মরু পাড়ি দিলেন। এইভাবে পালাক্রমে দিনের পর দিন অতিক্রম করে জেরুজালেম নগরীর প্রান্তে উপস্থিত হলেন। খৃস্টান নরপতি ও পাদ্রীগণ বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক যার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছেন সে উমরকে অভিবাদন জানাবার জন্যে উটের আরোহীর দিকে সসম্মানে এগিয়ে গেলেন। খলীফার গোলাম সিক্ত নয়নে চিৎকার করে বললেন, "উটের আরোহী খলীফা নয় উটের চালক খলীফা।" হযরত আবু উবায়দা (রা) সিরিয়ার রণাঙ্গন থেকে খলীফাকে স্বাগত জানাবার জন্যে স্বসৈন্যে জেরুজালেম নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। মুসলমান ও খৃস্টান সেনাপতি, নরপতি ও হাজার হাজার কৌতূহলী জনতা এ দৃশ্য দেখে হতবাক! এ ধরনের আর একটি দৃষ্টান্ত মানবজাতির ইতিহাস থেকে উল্লেখ করার জন্যে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা ইতিহাসের জীবন্ত উদাহরণ নয় বরং এটাই জীবন্ত ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ। আজ যখন বর্ণ, ধর্ম, প্রথা ও ভাষার বিভক্তিতে মানবতা খন্ডিত, বিভাজিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত ও পদদলিত মানুষের জন্যে হযরত উমরের মানবতাবাদী আদর্শ নিয়ে এসেছে ধুলায় ধুসরিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত গোলামকে মানবতার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার বিজয়বার্তা। উটের রশি হাতে হযরত উমর (রা) এর উপস্থিতি খৃস্টান জনপদকে এত অভিভূত ও বিস্মিত করেছিল যে তাদের যুগযুগ ধরে যুদ্ধ করার সমরাস্ত্র, তীর, বল্লম, উন্মুক্ত কৃপাণ সবকিছু হযরত উমর (রা) এর মানবতার কাছে আজ পরাভূত ও পরাজিত। বিনা যুদ্ধে বিনা বাক্য ব্যয়ে পবিত্র জেরুজালেম নগরীর চাবি তারা তুলে দিল খলীফা উমরের হাতে। খলীফা এত সাধারণ পোষাকে জেরুজালেম নগরীতে হাজির হলেন যে তার তালি যুক্ত বেদুইনদের পরিহিত জামা দেখে মুসলিম সৈন্যরাও আশ্চর্য্য হলেন, একজন খলীফার কানে কানে বলেই ফেললেন, "আপনি কি আরও সুন্দর পোষাক পরে খৃস্টানদের এ জনপদে আসলে ভাল হত না? হযরত উমর জবাব দিলেন–

আরবী

"আমাদের সম্মান বিচিত্র পোষাকের মধ্যে নেই, আমরাত সেই জাতি ইসলামই যাদেরকে মাথায় পরিয়ে দিয়েছে ইজ্জতের মুকুট। আমরা কি নির্বোধদের খুশি করার জন্যে আমাদের প্রিয় নবীর আদর্শ ত্যাগ করব?"

আজকের পৃথিবীর সমস্যা যেন একজন উমরের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর যে ব্যক্তিটি শুধু বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ছিল কম্পমান আর তাঁরই ন্যায়দন্ডের সামনে গোটা পৃথিবী ছিল কম্পমান।

nhiZ Dmgvb (iv) t
^ah I D`viZvi wegZ cZxK

❑ তিনিই ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) যার সাথে রাসূলে করীম (সা) তাঁর প্রিয় কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম (রা) কে পরপর বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তাকে যুন্নুরাইন বলা হয় অর্থাৎ দুই জ্যোতির অধিকারী। রাসূল করিম (সা) বলেন,

আরবী

"প্রত্যেক নবীর সাথে উম্মতের মধ্য থেকে একজন সাথী হবে, আমার জান্নাতের সাথী উসমান হবে।" –তিরমিযী

ইসলামের জন্যে হযরত উসমানের বিপুল ধন সম্পদ অকাতরে ব্যয় হয়েছে। তার ১২ বছরের খিলাফতের শেষাংশে মুসলমানদের মধ্যে হযরত উসমানকে নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয় এবং উসমান (রা) কে শাহাদাত বরণ করতে হয়।

❑ রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে একদিকে মদীনায় তখন দুর্ভিক্ষ চলছে, মৌসম ছিল প্রচন্ড গরমের আর পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ সাম্রাজ্যের সাথে সরাসরি যুদ্ধ। সে তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ চাদর বিছিয়ে দিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন। রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত ৩০,০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে দশ হাজার সৈন্যের অশ্ব, রশদ পত্র যাবতীয় সামানসহ ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব হযরত উসমান (রা) একাই বহন করেছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর এ কুরবানীর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

হিজরতের পর মসজিদে নববীর অনতি দূরে এক ইয়াহুদীর পানির একটি কূপ ছাড়া সুপেয় পানি সরবরাহের আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুযোগ বুঝে ইয়াহুদী উচ্চ মূল্যে পানি বিক্রয় শুরু করলে গরীব মুহাজির মুসলমানদের কষ্টের অন্ত থাকে না। নবীজি (সা) বলছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেউ নেই যে এ কূপ কিনে মুসলমানদের জন্যে 'ওয়াকফে আম' করে দেবে। হযরত উসমান (রা) অনেক উচ্চমূল্যে এ কূপ 'বীরে রুমা' ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে ওয়াকফ করে দেন। মুসলিম বিদ্রোহীরা যখন তার বাড়ী ঘেরাও করে তখন হযরত উসমানের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যিনি একদিন সবার জন্যে পানির কূপের ব্যবস্থা করে দিলেন। আজ তাকে পিপাসার্ত কণ্ঠে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। ৪০ দিন পর্যন্ত খলীফার গৃহে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল।

❑ হযরত আবু বকরের খিলাফতের যুগে দেশে একবার কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মুসলমানেরা অর্ধাহারে-অনাহারে দিনাতিপাত করেছিল। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হযরত উসমান গনির (রা) সাহায্য চাইলেন। মিসর থেকে তাঁর খাদ্য সামগ্রী বোঝাই হাজারের উপর উটের কাফেলা মদীনায় এসে পৌঁছতে ছিল হযরত উসমান (রা) খাদ্য সামগ্রী সহ হাজার উটের কাফেলা মুসলমানের বায়তুল মালে দান করে দেন। সেটা ছিল হযরত উসমানের বদন্যতার এক ঐতিহাসিক দলিল। একদিন যিনি ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছিলেন সে মুসলমানদের সন্তানেরা পরবর্তিতে হযরত উসমান (রা) ও তার পরিবারকে দিনের পর দিন অনাহারে রেখে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত খলীফাকে শহীদ করেছিল।

❑ ধৈর্য ও সবরের পরম দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর অন্তিম সময়ের কথামালাতে। মিসরের অত্যাচারী গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা) কে যার বিরুদ্ধে সাহাবী হত্যার অভিযোগ ছিল তাকে অবিলম্বে অপসারণ করে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা) কে তার স্থলাভিষিক করার গণ দাবীর মুখে হযরত উসমান (রা) নিজে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা) কেত মিসরের গভর্ণর নিযুক্তি পত্র মিখিয়ে বিদ্রোহীদের হাতে দিলেন। খলীফার নব নিযুক্ত গভর্ণর যখন মিসরের পথে। এমন সময় খলীফার গোলাম দ্রুতবেগে তাদেরকে অতিক্রম করার সময় সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে তাকে তল্লাশী করে একটি সরকারী চিঠি হযরত উসমানের সিলমোহর যুক্ত পাওয়া গেল। চিঠিতে আবদুল্লাহ বিন সাদ মিসরের গভর্ণরের কাছে লিখা ছিল "মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে মিসর পৌঁছা মাত্র কতল কর ও প্রত্যেক অভিযোগকারীকে দ্বিতীয় নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখ।" এ চিঠি ও বাহকসহ বিদ্রোহীরা মদীনায় এসে হযরত উসমান (রা) -এর বাস ভবন ঘেরাও করল। খলীফার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করে প্রতিশোধ ও পদত্যাগের জোরাল দাবী উঠল। অতঃপর হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর (রা) প্রমুখ সম্মানিত সাহাবীরা সমবেত হয়ে এ ব্যাপারে হযরত উসমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত উসমান (রা) শপথ করে বলেন– "আমি নিজে এ পত্র লিখিনি, কাউকে লিখতে বলিনি ও সেটা মিসরে প্রেরণ করতে বলিনি।" হযরত আলী

বললেন, "আশ্চর্যের বিষয় যে, পত্রবাহক আপনার গোলাম, বাহনের উষ্ট্রি আপনার এবং সীলমোহরও আপনার কিন্তু চিঠির মর্ম সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না।" পত্রের লিপি পরীক্ষা করে দেখা গেল ওটা দুষ্ট চক্র মারওয়ানের হাতের লেখা। সে খলীফার আত্মীয় ও তাঁর গৃহে লুকিয়ে ছিল। বিদ্রোহীরা দাবী করল মারওয়ানকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাকে হত্যা করা হবে এ ভয়ে খলীফা মারওয়ানকে তুলে দিতে অস্বীকার করলেন। তাদের দ্বিতীয় দাবী ছিল অন্যথায় খলীফাকে পদত্যাগ করতে হবে। হযরত উসমান (রা) বলল, 'যে পর্যন্ত আমার শেষ নিঃশ্বাসটি অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহর তায়ালা খিলাফতের মর্যাদার যে জামা আমাকে পরিয়েছেন তা আমি কখনও খুলতে পারব না। রাসূলের (সা) নির্দেশ মুতাবেক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করব।"

❑ বিদ্রোহীদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) খলীফার সামনে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, "হে রাসূলের প্রতিনিধি! আপনার গৃহের সামনে ৭০০ শত মুজাহিদ তরবারী হাতে দন্ডায়মান। আপনি নির্দেশ দিন, আমরা বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে চাই।" ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হযরত উসমান (রা) সেই কঠিন সময়ে বললেন, "আমি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে পারব না। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফা হয়ে নিজের জন্য মুসলিম জাতির রক্ত প্রবাহিত করতে দেব না।" অনুরূপ জবাব দিলেন আনসার নেতা হযরত যায়িদ ইবনে সাদ (রা) যখন লড়াইয়ের অনুমতি চাইলেন–"না, আমার জন্যে কেউ তরবারী কোষ মুক্ত করতে পারবে না। আজ এটাই আমার সবচাইতে বড় সহযোগিতা।" সে অবস্থায় তাঁর গৃহের ২০ জন কৃতদাসকে ডেকে তিনি বললেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তোমাদের সবাইকে আজ থেকে আজাদ করে দিলাম।"

পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠলে খলীফা অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্যথিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "আমি মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করছি। যাঁর কাছে আমার দশটি আমানত রক্ষিত রয়েছে।"

১. ইসলাম কবুলকারী রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্যে আমি চতুর্থ জন।

২. আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর স্বীয় কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

৩. তাঁর মৃতুর পর নবীজি (সা) তাঁর দ্বিতীয় কন্যাকেও আমাকে দান করেছেন।

৪. আমি জীবনে কখনও অশ্লীল সংগীত উচ্চারণ করিনি।

৫. আমি সজ্ঞানে কখনও আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমা লংঘন করার ইচ্ছা পোষণ করিনি।

৬. মুসলমান হওয়ার পর থেকে প্রতি জুমাবার একজন গোলাম আমি আজাদ করে আসছি।

৭. আমার সমগ্র জীবনে কোন দিন ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি।

৮. রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে বায়াত গ্রহণের পর আমার দক্ষিণ হস্ত কখনও লজ্জাস্থান স্পর্শ করেনি।

৯. মুসলমান হওয়ার আগে ও পরে আমি কখনও অনের সম্পদ আত্মসাৎ করিনি।

১০. নবীয়ে করীম (সা) এর উপস্থিতিতে আমি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ হেফজ করেছি।

❑ *kvnv`vZ*

সেদিন ছিল জুমাবার। খলীফা হযরত উসমান (রা) ছিলেন রোজাদার। ভোরে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, আল্লাহর রাসূল (সা), হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা) কে সাথে নিয়ে উসমানকে ডেকে বলছেন, 'উসমান! শীঘ্রই চলে এসো, আমি তোমার ইফতারের অপেক্ষায় আছি।' ঘুম থেকে উঠে খলীফা স্ত্রীকে বললেন, "আমার শাহাদাত আসন্ন। বিদ্রোহীরা আজই আমাকে হত্যা করবে।" তিনি নতুন জামা ও পায়জামা পরিধান করলেন। কুরআন শরীফ হাতে নিলেন যে কুরআনের সাথে ছিল তাঁর সারা জীবনের সম্পর্ক। তিনি ছিলেন 'হাফেজুল কুরআন' ও 'জামেউল কুরআন'। তিলাওয়াতে মশগুল হলেন। আর তিল তিল করে শাহাদাতের আবেহায়াত পান করার অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে মুহাম্মদ বিন আবু বকরের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা তীর নিক্ষেপ করে করে খলীফার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলো। হাসান ইবনে আলী (রা) দরজার পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি গুরুতর আহত হন। প্রাচীর ভেঙ্গে তারা ঘরে ঢুকে পড়ল। হযরত উসমান (রা) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে মুহাম্মদ বিন আবু বকর

হযরত উসমান (রা) এর দাড়ি মোবারক ধরে সজোরে টান দিল। আমীরুল মুমিনীন বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! আজ যদি তোমার পিতা হযরত আবু বকর (রা) জীবিত থাকতেন তিনি এ দৃশ্য কিছুতেই পছন্দ করতেন না।" এ কথা শুনে মুহাম্মদ বিন আবু বকর লজ্জিত হয়ে পিছু হটে গেল। কিন্তু বিদ্রোহী কেনানা ইবনে বশীর লোহার দন্ড দিয়ে খলীফার মস্তকদেশে এক নিদারুণ আঘাত হানল। দ্বিতীয় আঘাত করল সাওদান ইবনে হামরান এবং পাপিষ্ঠ আমর ইবনুল হাকাম নায়েবে রাসূলের বুকের উপর বসে ধারাল তরবারী দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। খলীফার স্ত্রী নায়েলা (রা) বাধা দিলে তাঁরও তিনটি আঙ্গুল কেটে গেল। আর শাহাদাত বরণ করলেন রাসূল পাকের তৃতীয় খলীফা আল্লাহর কুরআনের শ্রেষ্ঠ সেবক হযরত উসমান (রা)। খলীফার পবিত্র খুন কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতখানি রঞ্জিত করে দিয়েছিল।

আরবী

"আল্লাহ তোমার জন্যে যথেষ্ট-তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন"- আল বাকারা

তিনদিন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত উসমানের লাশ গৃহ থেকে বের করতে দেয়নি। অতঃপর হযরত আলী উসমানের লাশ গৃহ থেকে বের করতে দেয়নি। অতঃপর হযরত আলী বাহু বলে বিদ্রোহীদের সরিয়ে তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে গভীর রাতে জানাযার নামাজ শেষে জান্নাতুল বাকির কবরস্থানে দাফন করেন। মাত্র ১৭ জন মানুষ এ জানাযায় অংশ নেয়। হিজরী পঁয়ত্রিশ সনের আঠারই জিলহজ্ব জুমাবার বেলা চার ঘটিকায় হযরত উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

nhiZ Avjx Be‡b Awe Zwje (iv) t
mv`wmav Rxeb hvcbKvix Ljxdv

❑ কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, হিযরতের রাতে রাসূল (সা) এর চাদর গায়ে দিয়ে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়ে যিনি শুয়ে ছিলেন তিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)। রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধে যিনি অংশগ্রহণ করেছেন ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আসাদুল্লাহ–আলী (রা) একমাত্র তাবুক যুদ্ধে তিনি অংশ নেননি। কারণ তিনি রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মদীনায় ছিলেন। আলী (রা) আরজ করলেন "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সাথে কি যুদ্ধে যাবনা? আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন"? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'হারুন মূসার জন্যে যে রূপ ছিল তুমি আমার জন্যে সেরূপ-তবে আমার পরে আর কোন নবী নেই"– হাদীস। তাঁর গোটা জীবনটাই ইসলামের জন্য কুরবান। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য কবিতা, প্রজ্ঞা-হিকমাত, বিচার-প্রশাসন, বিনয়-সাহস, মানবতা-সবর সহ আলী যেন সকল মানবীয় গুণাবলীর সমষ্টি। যাঁর গোটা জীবন ও জীবনের প্রতিটি অংশ যেন দৃষ্টান্ত আর দৃষ্টান্ত। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে দেখিয়ে বললেন "হে আনাস! এ সেই আলী, যে সমগ্র সৃষ্টির জন্য হুজ্জাত।" –আল হাদীস।

❑ এ নিবন্ধে আমি হযরত আলী (রা) এর দারিদ্র, সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দু' একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। মুসলিম উম্মাহর পরাজয় ও ধ্বংস নিয়ে এসেছে আজ জৌলুস, আরামপ্রিয়তা, পরিশ্রম বিমুখতা ও ভোগ বিলাস। আর হযরত আলীর জীবন থেকে জীবিকার অভাব-অনটন কোন দিন বিদূরিত হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে তিনি নিজেই বলেছিলেন 'রাসূলুল্লাহর সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পাথর বেঁধে থেকেছি, খলীফা হওয়ার পরও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে আমার জীবন কাটছে।"

❑ রাসূল (সা) বলেন,

আরবী

"আমি জ্ঞানের নগরী ও আলী (রা) সেই নগরীর প্রবেশ দ্বার।"

দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা জ্ঞানার্জনের জন্যে হযরত আলীর কাছে আসতেন। তারা দেখে আশ্চর্য হতেন খলীফা হয় উট চরাচ্ছেন, কৃষকের মত মাঠে কাজ করছেন, নিজ হাতে গৃহস্থালির কাজ আনযাম দিচ্ছেন, সর্বদা মোটা, ছেঁড়া ও তালিযুক্ত পোষাক পরতেন।

হযরত সালমান ফারসী বলেন, 'কি আশ্চর্য সংসার? রাসূল তনয়া ও হযরত আলী নিঃস্ব শ্রমিকের জীবন যাপন করছেন। দরিদ্র মানুষদের নিকট সম্পদের সবটুকুন বিলিয়ে দিয়ে এ পরিবার দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতেন।"

❑ ফিজ্জা নামের হযরত ফাতিমার একজন চাকরানী ছিলেন। ব্যবস্থা ছিল একদিন ফাতিমা আর একদিন ফিজ্জা পালাক্রমে সাংসারিক কাজ করবেন। যদি ফিজ্জার ছুটির দিন ফাতিমা অসুস্থ হতেন তবে ফিজ্জাকে সেদিনও কাজ করতে হতো না। সেদিন হযরত আলী (রা) নিজে যব ভাঙতেন, উনুন জ্বালাতেন, রুটি তৈরী করতেন এবং সংসারের অন্যান্য কাজ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

❑ ইবনে আবি রাফে বর্ণনা করেন, 'কোন এক ঈদের দিন আমি হযরত আলীর (রা) কাছে যাই। আমি দেখলাম একটি সিলমোহর যুক্ত থলে আনা গলো। খলীফা তা খুলে কয়েকটি শুকনো রুটি বের করলেন এবং পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ জাতীয় রুটি সীল গালা করার কি প্রয়োজন? খলীফা মৃদু হেসে বললেন, "আমি সীল করে রাখি কারণ আমার ছেলে মেয়েরা তৈল ও মাখন যুক্ত নরম রুটি মিশিয়ে দিতে চেষ্টা করে।" আমি আবার বললাম, আল্লাহ পাক কি আপনার জন্যে ভাল খাবার হারাম করে দিয়েছেন? খলীফা বললেন, "না, হে আবি রাফে! খলীফার জন্যে সে খাদ্যই সঙ্গত যা আমার খিলাফতের দরিদ্রতম ব্যক্তিও দিনে একবার আহার করতে পারে। প্রজাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হলে আমি খাবারের মানও উন্নত করব।"

❑ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, একদিন খলীফার সাথে নাস্তা করতে সম্মত হলাম। অত্যন্ত নিম্ন মানের খাবার আমাদের সামনে আনা হলো। আমি বললাম, মুসলিম জাহানের খলীফার নাস্তার মধ্যে অন্ততঃ কিছু গোস্ত থাকবে আশা করেছিলাম। খলীফা হেসে বললেন, 'আপনি সম্পদশালী রাজাদের কথা শুনছেন, তারা বিলাস বহুল জীবন যাপন করতেন। আমাকে একজন দরিদ্র সাদাসিধা জীবন যাপনকারী খলীফা হতে দিন। আমি একজন সাধারণ গরীব মানুষের জীবন যাপন করতে চাই।"

❑ আমর ইবনে কায়েস খলীফা আলীকে (রা) তালি যুক্ত ও মোটা সাধারণ কাপড় পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, জওয়াবে খলীফা বলেন, "হে আমর! এমন তালিযুক্ত ও মোটা কাপড় তোমার হৃদয়কে করবে কোমল এবং দূর করবে তোমার অহংকার।" –কানযুল উম্মাল

❑ কুফা নগরীর প্রসিদ্ধ জামা বিক্রেতা আবু নুজিয়া বর্ণনা করেন, "একদিন হযরত আলী তার দোকান থেকে দু' টি জামা খরিদ করেন অপেক্ষাকৃত ভাল ও উন্নত জামাটি খলীফা তাঁর গোলাম কাম্বারকে প্রদান করেন ও নিম্নমানের জামাটি নিজের জন্য রাখেন।"

❑ হারুন ইবনে আনজা বর্ণনা করেন, "একবার আমি খলীফার সাথে দেখা করতে গেলাম আমার পিতার সাথে। তখন ছিল দারুণ শীতের সময়। তিনি শীতের হিমেল হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপতেছিলেন। আমার পিতা বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! বায়তুল মালে আপনার ও আপনার পরিবারের অধিকার স্বীকৃত আছে। আপনি কেন সে অধিকারের সদ্ব্যবহার করছেন না"। জবাবে খলীফা বলেন, "ওহে আনাজ! মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে আমি কিছুই গ্রহণ করতে চাই না। আমার গায়ের পাতলা জামাটিও মদীনা থেকে এনেছি।"

আজকের বিলাসিতা ও জীবনের মান বৃদ্ধির প্রতিযোগীতার মাঠে আমরা বৈধ ও অবৈধতার সীমা লংঘন করে চলছি। একদিকে মুসলিম রাষ্ট্র নায়কেরা ভোগের সাগরে ভাসমান প্রমোদতরীতে উল্লাসে রত আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে চলছে দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাত, চলছে ক্ষুধার্ত বনি আদমের কংকাল মিছিল। এমতাবস্থায়, হযরত আলীর অনাড়ম্বর জীবন হোক আমাদের সকলের জন্যে সুবহে সাদেকের আলো।

❑ হযরত আলীর সাথে জীবন ব্যাপী যার সংঘাত লেগে ছিল সে আমীরে মোয়াবিয়া একদিন হযরত আলীর বন্ধু দ্বারা ইবনে দ্বামরার কাছে আলী (রা) চরিত্র বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, 'হযরত আলী অত্যন্ত দুরদর্শী, দুঃসাহসী, শক্তিশালী, ন্যায় বিচারক, প্রতিটি কথা হেকমাতে পরিপূর্ণ, দুনিয়ার প্রতি ছিল অনিহা, নিশি জাগরণকারী, পরকালের চিন্তামগ্ন, সাদাসিধা পোষাক পরিধানকারী, মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু, ন্যায়ের সমর্থক ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধীতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য"। এ বর্ণনা শুনে মুয়াবিয়সহ অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিল সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া মন্তব্য করেন, "আল্লাহর কসম! আবুল হাসান হযরত আলী এমন গুণের অধিকারী ছিলেন।"

nhiZ Zvjnv Be‡b Devq` jvn (iv) t
GK Rxeš knx`

❑ কুরাইশদের প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান তালহা (রা)। তার চাচা হযরত খাদীজার ভ্রাতা নওফল ইবনে খুয়াইলিদ ছিল কুরাইশ সিংহ নামে খ্যাত। মাসউদ ইবনে খারাশ বলেন, "একদিন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করছিলাম, দেখলাম একদল লোক হাত পা বেঁধে একটি যুবককে নিয়ে আসছে উপুড় করে। বেদম ভাবে প্রহার করছে। আর একটি মহিলা গলা ফাটিয়ে গালাগালি দিচ্ছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটির কি হয়েছে? তারা বলল ঃ এ হচ্ছে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ সে নাকি বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর নবুওয়াতের উপর ঈমান এনেছে। আর কঠোর ভাষায় ভৎসনাকারী মহিলাটি তার মা সাবা বিনতে আল হাদরাসী।

❑ ইসলামের প্রতি তার অনুরাগ ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভালবাসা ছিল সীমাহীন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল চমকপ্রদ, তিনি বলেন, 'ব্যবসা উপলক্ষে আমি তখন বসরায়। একজন বয়স্ক খৃস্টান পাদ্রী বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন লোক আছে কিনা? নিকট থেকে আমি বললাম, হ্যাঁ আমি মক্কার অধিবাসী, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে আহমদ নামে আখেরী রাসূল কি আত্মপ্রকাশ করেছেন? আমি আবার বললাম কোন আহমদ, তিনি বললেন, 'আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুতালিব। এটা তাঁর জাত প্রকাশের মাস। তিনি হবেন আখেরী রাসূল। মক্কায় জাহের হবেন কিন্তু খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। যাও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর ও তাঁকে সাহায্য কর।" "তাঁর কথায় আমার অন্তর আলোকিত হলো। আমি কাফেলা ত্যাগ করে সাওয়ার আরোহন করে মক্কায় গেলাম। জানতে পেলাম, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নবুওয়াতের দাবী করছে আর আবু কোহাফার পুত্র আবু বকর তার অনুসারী হয়েছে। আমি রাসূলের নিকট গেলাম আবু বকরের সাহায্যে আর পাদ্রীর ঘটনা বললাম, কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ঈমান আনলাম।"

ইসলাম কবুল করার পর বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার, মুতাসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

❑ আমি শুধু ওহুদের রণাঙ্গনে তাঁর ত্যাগের দৃষ্টান্ত আলোচনা করতে চাই। হিজরী তৃতীয় সনে মুশরিকদের সাথে সংঘটিত হয় ওহুদের যুদ্ধ। তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। খালেদের আক্রমণে মুসলমানেরা দিশাহারা। ৭০ জন মুসলিম বীর শাহাদাত বরণ করেছেন। শহীদ হয়েছেন রাসূলের চাচা হযরত হামজা (রা) যার লাশ ৮০টি টুকরায় বিভক্ত করা হয়েছে। অনেকে পালাচ্ছিল, ইবনে কমিয়ার তীরের আঘাতে রাসূলুল্লাহর (সা) দান্দান শহীদ হলো, লোহার টুপি ভেদ করে তীর রাসূলের মস্তক মোবারকে ঢুকে পড়েছে। কসওয়া থেকে নবীজি (সা) গড়িয়ে পড়ে গেলেন। যুদ্ধের মাঠে আওয়াজ উঠল মুহাম্মদ (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। যে ১০/১২ জন বীর অটল ও অবিচল হয়ে রাসূল (সা) কে ঘিরে রেখেছিলেন হযরত তালহা তাদের অন্যতম। হযরত আবি দোজানা (রা) তীরের বৃষ্টির মধ্যে রাসূল (সা) কে বুকের ভিতর নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন। তীরের বৃষ্টির মধ্যেও স্বীয় বক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহকে ছাড়েনি। আর হযরত তালহা (রা) উন্মাদ হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে নিক্ষিপ্ত তীরগুলোকে নিজ পিঠে ধারণ করতে ছিলেন যেন রাসূলকে স্পর্শ করতে না পারে আর কঠিন ভাবে শত্রুকে প্রতিহত করতে ছিলেন। অসহ্য অবস্থায় নিজকে বলতে ছিলেন, "হে তালহা! আমি কি আমার রক্ত, গোস্ত ও জীবনকে রাসূলের জন্যে ওয়াকফ করে দেয়নি"? অতঃপর হযরত আলী এগিয়ে এসে শত্রুদের উপর বেরহম আক্রমণ শুরু করলে তারা নবীজিকে (সা) আহত রেখে পিছে হটে গেল। শেষে হযরত তালহা রাসূল (সা) কে নিজের কাঁধে বহন করে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে রাখলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর (রা) রাসূলকে খেদমত করতে দৌড়ে আসলে নবীজি (সা) বললেন, 'আমাকে নয়, তোমরা তালহাকে দেখ।" আবু বকর (রা) বলেন, "আমি দেখি হযরত তালহা একটি গর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। একটি হাতের সমস্ত আঙ্গুল নেই, সারা শরীর তীর নেজার আঘাতে জর্জরিত।" রাসূলুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছিলেন, "যদি কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখতে চাও তবে ঐ তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখ" তাই তালহাকে 'জীবন্ত শহীদ' বলা হয়।"

❑ ইসলাম ও মুসলমানের জন্যে আজ ইতিহাসের এক কঠিন সময় যাচ্ছে। খৃস্টান, ইয়াহুদী মুশরিকরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের common শত্রু মুসলমানদের বিনাশ সাধনে। একদিকে তারা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছে অনৈক্যের দাউ দাউ আগুন। অপরদিকে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও শাসকদের মাথা তারা ক্রয় করে তাদের গোলামীতে নিয়োজিত রেখেছে। আবার মুসলিম চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ জাতীয় সচেতন অংশের বিরাট অংশকে অঢেল অর্থ, আন্তর্জাতিক পুরস্কার, নারী, গাড়ী ও বাড়ী ইত্যাকার ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে বন্ধক রেখে তাদের জবান, কলম ও মস্তিষ্ককে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অতি স্বার্থকভাবে ব্যবহার করছে। আর যাদেরকে কোন কিছুর বিনিময়ে ক্রয় করা যায়নি; যাদেরকে কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী পুনঃজাগরণের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি তাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী, ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী বলে প্রথমে চিহ্নিত করা ও হত্যা Target করার জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এ অশুভ পকিল্পনা বাস্তবায়নে ইসলামের জঘন্য শত্রু প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো Million Million ডলার ব্যয় করছে। আর তাদের অস্ত্রাগারে সঞ্চিত অকল্পনীয় মারাত্মক মারণাস্ত্র ইসলামী আন্দোলনের জেন্দাদিল কর্মীদের অকাতরে হত্যার বীভৎস উল্লাসে ব্যয় হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতেও বিপ্লবীদের ভয় পেলে চলবেনা। ওহুদের কঠিনতম সময়ে তীরবিদ্ধ রাসূলে কারীম (সা) যখন জ্ঞানহারা ও হুঁশহারা হয়ে পড়েছিলেন হযরত তালহার (রা) নেতৃত্বে যে গুটিকয়েক সাহাবী জীবন হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে অটল ও অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ ইসলামকে ঘিরে সে হিম্মত ও সবরের সাথে ময়দানে দাঁড়াবার ডাক এসেছে। আর ইসলামের দিকে নিক্ষিপ্ত শত্রুদের কামানের উত্তপ্ত গোলা নিজ বক্ষে ধারণ করার ও বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনই আজকের সময়ের প্রয়োজন।

nhiZ hevBi Bebj AvIqvg (iv) t
ivmjjvn (mv) Gi nvIqvix

❑ তিনি ছিলেন খাদীজা (রা)-এর ভাই আওয়ামের পুত্র। তিনি হযরত রাসূলের (সা) ফুফী হযরত সুফিয়ার ছেলে। আবার তিনি হযরত আবু বকরের কন্যা আসমার স্বামী। তিনি ২০ বছর বয়সের মধ্যে ইসলাম কবুল করেন।

একদিন গুজব শুনলেন রাসূল (সা) কে হত্যা অথবা বন্দী করা হয়েছে। উন্মুক্ত তরবারী হাতে জনতার ভিড় ঠেলে সে কিশোর রাসূলের খোঁজে তাঁর দরবারে হাজির হন। নবীজি (সা) জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে যুবাইর? তিনি বললেন, শুনেছিলাম আপনি বন্দী বা নিহত হয়েছেন। আমি রাসূলের খুনের বদলা নিতে বের হয়েছি। হুজুর (সা) খুশি হয়ে তার জন্যে দোয়া করলেন।

❑ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। বদরের রণপ্রান্তরে শত্রুর উপর আঘাত করতে করতে তার তরবারী ভোতা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মাথায় ছিল হলুদ রংয়ের পাগড়ী। রাসূল (সা) বলেছিলেন, "ফিরিশতাগণ আজ যুবাইরের মত হলুদ পাগড়ী পরে এসেছে।"

❑ খন্দকের কঠিন যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের সময়ে মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনী কোরায়যা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘনের সংবাদ পেয়ে, রাসূল (সা) বললেন, 'কে আমাকে তাদের গোপন সংবাদ এনে দিতে পারবে? তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেকবারই হযরত যুবাইর (রা) বললেন, "আমি"। রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য হাওয়ারী আছে, আমার হাওয়ারী যুবাইর"। যুবাইরের বীরত্ব ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনে মুগ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, "হে যুবাইর! তোমার জন্যে আমার (রাসূলের) মাতাপিতা কুরবান হোক।" রাসূলের এ উক্তি নিয়ে হযরত যুবাইর গর্ববোধ করে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একমাত্র যুবাইয়ের জন্য তাঁর নিজ মাতাপিতাকে কুরবানীর উক্তি প্রকাশ করেছেন।

❑ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলের সাথে দশ হাজার সাহাবী অংশ নিয়েছিলেন। এ বাহিনী বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। রাসূল (সা) এর ক্ষুদ্র দলটির ঝান্ডা ছিল তাঁর হাওয়ারী যুবাইর (রা) এর হাতে।

❑ উষ্টের যুদ্ধ চলছে একদিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আম্মাজান আয়েশা (রা) ও মুয়াবিয়ার বাহিনী সাথে তালহা ও যুবাইর (রা) ও অপর পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হযরত আলী (রা) মর্মান্তিক সে যুদ্ধে হযরত আলী (রা) ঘোড়ায় চড়ে দুই পক্ষের মাঝামাঝি এসে যুবাইরকে ডেকে বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ! রাসূলে পাকের কথা কি তোমার স্মরণে আছে? যে দিন তুমি ও আমি হাত

ধরে নবীজির (সা) স্বাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম; রাসূলে কারীম (সা) জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি আলীকে ভালবাস?" তুমি বলেছিলে, "হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ" স্মরণ কর! অতঃপর রাসূল (সা) বলেছিলেন, হে যুবাইর! একদিন তুমি অন্যায়ভাবে আলীর সাথে যুদ্ধ করবে।" (ইস্তিয়াব)

রাসূলের বাণী শুনার সাথে সাথে তিনি তরবারী কোষাবদ্ধ করলেন ব্যথিত মনে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কে বললেন, "আমি ভুলের উপর যুদ্ধ করছি। আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।" যদিও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ পিতার মনোভাব সমর্থন করলেন না, হযরত আয়েশা (রা) এর সাথে রয়ে গেলেন। শুধু রাসূল (সা) এর হাদীস শুনার সাথে চরম মুহূর্তে হযরত যুবাইর (রা) এর মনোভাব পরিবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্ত উম্মতের জন্য এক অকাট্য দলীল।

❑ আমরা যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের রুচি, অভিরুচি, সমাজের রীতিনীতি, বেশীর ভাগ মানুষের মতামতের প্রাধান্য দেই। কিন্তু সাহাবীদের জিন্দেগীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এর একটিও কোন মূল্য বহন করেনি। আল্লাহর কিতাব ও মুস্তাফা (সা) এর সুন্নাহ ছিল তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ামক শক্তি। যুদ্ধের কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও সত্যকে উপলব্ধি করার সাথে সাথে সত্যের সাক্ষ্য দিতে সাহাবীরা পিছপা হননি। বিশেষ করে নিজের মতামত কুরবানী এক কঠিন বিষয়। অনেক উঁচু মাপের মানুষকেও নফস পূজার দোষে দুষ্ট দেখেছি। আর চলমান রীতিনীতির বিবেক বর্জিত অনুসরণ, পীর ও পৌরহীতদের অন্ধ তাকলিদ বা নিজদল ও দেশের প্রতি ন্যায়-অন্যায়ের চিন্তা ছাড়া ভালবাসা আমাদের ভয়াবহ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বুঝা উচিত নফস, সমাজ, দেশ ও জাতীর পূজারীরা আল্লাহ পূজারী নয়। আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার অন্যতম শর্ত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সব দাসত্বের শৃংখল খুলে ফেলা। উম্মতের আজকের দুর্দিনের ঘনঘোর সেদিন কাটবে যেদিন তারা যাবতীয় বিষয়ে তাদের বিরোধ মিমাংসার জন্যে সব কিছু ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ফিরে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এর জীবনের একটি সামান্য ঘটনা আলোচনায় আনা হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটি অসামান্য। রাসূল (সা) -এর একটি বাণীর মর্যাদা কতটুকু যা রক্ষা করার প্রয়োজনে তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে সাথে সাথে পিছে হটে গেলেন; হযরত মুয়াবিয়ার দল ত্যাগ করলেন এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়া হযরত আয়েশা (রা) কে ছেড়ে যেতে এক মুহূর্ত বিলম্বে করলেন না, সহযোদ্ধাদের এমনকি নিজের ছেলের নিষেধেও তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি, এমনকি যে কারণে কিছুক্ষণ পরেই তাকে শাহাদাত বরণ করতে হলো। এতসব কিছুর চেয়ে তার কাছে নবীয়ে কারীম (সা) এর একটি হাদীস এর মূল্য ছিল অনেক বেশী। "হে মাবুদ! উম্মতের মুহাম্মদীকে হাদীসে রাসূলের প্রতি এ মর্যাদাবোধ আপনি বখশিস করুন।"

❑ একদিন হযরত যুবাইর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তালহা ও যুবাইর (রা) সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? তিনি বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনের উপর রহম করুন। আল্লাহর কসম, তাঁরা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত সংযত, পুণ্যবান, সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণকারী তাকওয়া ও পরহেজগারীর অনুসারী, শাহাদাত বরণকারী, শুভ সংবাদ প্রাপ্ত ও আশারায়ে মুবাশশারাহ এর অন্তর্গত।"

nhiZ Ave`i ingvb Be‡b AvDd (iv) t
mv‡nej wnhivZvBb

❑ রাসূলে কারীমের নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথমে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত উসমান, সাইদ, তালহা, যুবাইর এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)। এরা সকলেই হযরত আবু বকর (রা) এর দাওয়াতের ফসল। তিনি মক্কার অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তার উপর কুরাইশদের বেশী নির্যাতনের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে হাবশায় হিযরতের নির্দেশ দেন। আবার রাসূল (সা) মদীনায় হিযরত করার পর তিনিও মদীনায় হিযরত করেন। আবিসিনিয়া ও মদীনায় দুই স্থানে হিযরতকারীদের বলা হয় 'সাহিবুল হিযরাতাইন'।

❑ তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ প্রায় সকল জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান, সাহসী, বিচক্ষণ ও দুরদর্শী। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। হিযরতের পরে তার আনসারী ভাই! সাদ ইবনে রাবী সহায় সম্পদ সব কিছুর অর্ধেক অংশ আবদুর রহমানকে দিতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, ভাই! এসব কিছুই আমার প্রয়োজন নেই।

আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দেন। পরে তিনি ব্যবসার মাধ্যমে মদীনার অন্যতম ধনবান হয়েছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর জন্যে দোয়া করেছিলেন। ঘি এবং পনিরের ব্যবসা করে কর্পদকহীন হয়ে যিনি মদীনায় এসেছিলেন। তিনি হয়েছিলে মদীনার অন্যতম ধনাঢ্য ও সফল ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদের প্রতি তিনি ছিলেন নির্মোহ। ইসলামের পথে মানবতার প্রয়োজনে তার অর্থ কুরবানীর দৃষ্টান্ত এখন তুলে ধরতে চাই।

❑ একদিন মদীনার অলিতে গলিতে বিরাট হৈ চৈ পড়ে গেল, মদীনায় দেখা গেল ধূলির ঝড়। দেখা গেল মাইল ব্যাপী দীর্ঘ উটের সারি মদীনায় প্রবেশ করছে। প্রচুর দ্রব্যসামগ্রীর বোঝা বহনকারী প্রায় ৭০০ হৃস্টপুস্ট উটের এ কাফেলা পণ্য নিয়ে মদীনায় এসেছে। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিরাট কাফেলা কার? লোকেরা বলল, 'আবদুর রহমান ইবনে আউফের'। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ থেকে শুনেছি, "আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফকে হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখেছি।" হযরত আবদুর রহমান (রা) এ মন্তব্য পাওয়ার সাথে সাথে আম্মাজান হযরত আয়েশার (রা) নিকট গমন করে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে চাইলেন ও শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন– "হে মা! আমার জন্যে দোয়া করবেন আমি যেন দাঁড়িয়ে ও হেঁটে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালার শপথ! এ পুরো কাফেলা এবং পণ্য বাহী সকল উট মালামাল সহ আল্লাহর রাহে আমি দান করে দিলাম।" এত বড় হৃদয়ের অধিকারী ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)।

❑ তাঁর দানশীলতা একটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি দান করে যেতেন একহাতে, দুহাতে, প্রকাশ্যে, গোপনে, দিবসে ও রজনীতে। একবার তিনি কিছু ভূমি ৪০ হাজার দিনারে বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা) - এর আম্মা হযরত আমিনার গরীব পিতৃ পুরুষদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। উম্মেহাতুল মুমিনীনদের জন্যে তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম এর সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁর এ ত্যাগের উপর সন্তুষ্ট হয়ে দোয়া করে বলেন, "হে আল্লাহ আপনি আবদুর রহমানকে জান্নাতের সালসাবিল নহরের সুপেয় পানি পান করার তাওফিক দিন।"

❑ ইবনে হাজার 'আল ইসাবা' গ্রন্থে বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) ত্রিশ হাজার গোলাম তাঁর জীবনে নিজ অর্থে ক্রয় করে আযাদ করেছেন।" তিনি তাঁর মৃত্যুকালে সমস্ত বদরী সাহাবীদের জন্যে তখনও একশত বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন তাঁদের প্রয়োজনের জন্যে তার সম্পত্তি থেকে ৪০০ শত দীনার অসিয়ত করে যান। এমনকি হযরত উসমান (রা)ও তাবারক হিসাবে নিজের অংশ গ্রহণ করেন। মৃত্যুর বিছানায়ও তিনি দরিদ্র মুসলমানদের অভাবের কথা ভোলেননি, তিনি পঞ্চাশ হাজার দীনারের এক হাজার ঘোড়া বায়তুল মালে দান করার ঘোষণা দিয়ে যান।

❑ তার সামনে উত্তম আহার দেয়া হলে তিনি চোখের পানিতে চোখ ভিজিয়ে বলতেন "আহা রাসূলুল্লাহ যবের রুটিও পেট পুরে আহার করে যেতে পারে নি"। একদা তিনি ছিলেন রোজাদার ইফতারীর বিভিন্ন আহার্য দেখে তিনি বলেন, "মুসায়েব বিন উমাইর (রা) ছিলেন আমাদের চেয়ে উত্তম। ওহুদে শহীদ হওয়ার পর একখন্ড পূর্ণ কাপড় দিয়ে আমরা তাকে দাফন করতে পারিনি। আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সব দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছেন"। এ বলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়ি ভিজিয়ে দিলেন।

আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) সম্পদ যেভাবে দ্বীন বিজয়ের প্রয়োজনে, মুসলমানদের দারিদ্র্য বিমোচনে, পরিবার কল্যাণে ও নবী পরিবারের জন্যে অকাতরে ব্যয় করেছেন তা আমাদের সকলের জন্যে অনুকরণযোগ্য এক দৃষ্টান্ত।

nhiZ mv` Be‡b Awe Iqv°vm (iv) t ZvIqv°‡ji Abb¨ D`vniY

❑ তিনি ১৭ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মাতৃকূলের আত্মীয়। রাসূলুল্লাহর মা আমিনা এবং সাদ এর পিতা মালিক ছিলেন চাচাত ভাইবোন। সাদ (রা) এর মাতা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালীনি মহিলা। মায়ের প্রভাব ছিল তার উপর অত্যন্ত বেশী। পুত্রের ইসলাম কবুল করার কারণে মা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, সে যদি ইসলাম ত্যাগ না করে আমি দানাপানি গ্রহণ করব না। এদিকে পানি পর্যন্ত গ্রহণ না করে সাদের মা অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। আবার সাদও মায়ের জন্যে

খাদ্য পানীয় ত্যাগ করলেন। রাসূলের দরবারে গিয়ে ফায়সালা চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত জানিয়ে কুরআনের আয়াত পড়লেন– আরবী

"আমি মানুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে, যদি তারা তোমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে শিরক করার জন্যে যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করবেনা।" –আনকাবুত : ৮

অতঃপর মুমূর্ষ মায়ের কাছে গিয়ে সাদ বললেন, "মা তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলকে এর চেয়েও বেশী ভালবাসি। আল্লাহর কসম, মা তুমি যদি হাজার বারও মৃত্যু বরণ কর আমি অশ্রুসিক্ত হব কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করতে পারব না।" –মুসলিম শরীফ, আল ফাদায়িল অধ্যায়

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের এ কঠিন জবাবটি তার আম্মার হৃদয়ে দাগ কাটে। অবশেষে তিনিও ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন।

❑ এই নিবন্ধে তাঁর জীবনে আল্লাহ তায়ালার উপর একান্তভাবে তাওয়াক্কুল ও গায়েবী সাহায্য নিয়ে কথা বলতে চাই। মানুষের জীবনে এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে যখন পৃথিবী ও পার্থিব সব কিছু নিরুপায় হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তখন একমাত্র সহায়। মুমিনদেরকে জীবনের প্রতিটি বাঁকে আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে কোন তদবীর বা প্রচেষ্টা করতে হবেনা। বরং তদবীর করা সুন্নাতে রাসূল।

❑ সে সময়ে ইরান ও রোমান সাম্রাজ্য দুনিয়া জুড়ে ছিল। এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্য। শত শত বছর ধরে পৃথিবীর উপর তাদের বিজয় কেতন উড়ছিল। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের জামানায় এই দুই প্রবল শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামের প্রচন্ড সংঘাত শুরু হলো। যে সাহসী সেনাপতি ইরানের রাজ মুকুট ছিনিয়ে এনেছিলেন আর উড়িয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের বিজয় কেতন সাসানীয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে, তিনি আর কেউ নন-সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)। ইরানীদের সাথে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল কাদেসীয়ার রণাঙ্গনে। মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে খলীফা উমর (রা) নিজেই কাদেসীয়ার প্রান্তরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আলী (রা) দ্বিমত প্রকাশ করে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এর নাম প্রস্তাব করেন। কাদেসীয়া যুদ্ধে সেনাপতি হিসাবে বিদায় দেয়ার প্রাক্কালে হযরত উমর (রা) বললেন, "হে সাদ! তুমি রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী ও তার আত্মীয়। এ চিন্তা যেন তোমাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে। জেনে রাখ, আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে তার বন্দেগী ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ ও অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে কোন তারতম্য নেই। মর্যাদা শুধু তাকওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্মরণ কর, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করতেন, তুমি মুজাহিদদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে।" ত্রিশ হাজার মুজাহিদ পারস্যের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেছেন এর মধ্যে ৯৯ জন বদরী সাহাবী, ৩০০ শ' জন রাসূলুল্লাহ সাথে বায়তুর রিদওয়ানে বায়াত গ্রহণকারী, মোট ৭০০ শত সাহাবী ও বাকিরা তাবেয়ী, কয়েক হাজার নারীও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

হিরার নিকটস্থ কাদেসীয়ার প্রান্তরে ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে দুনিয়া কাঁপানো বীর রুস্তম মুখোমুখি হলেন। ইরানীদের সৈন্য সংখ্যা রশদপত্র, হাস্তী বাহিনী সবকিছু ছিল ভয়াবহ। হযরত সাদ (রা) আমীরুল মুমিনীনকে আরও সাহায্যের প্রয়োজন জানিয়ে জরুরী খবর পাঠালেন। তিনি জবাব দিয়ে সাদকে চিঠি পাঠালেন, "হে সাদ! তুমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর আত্মীয়, দশজন সম্মানিত আশারা মুবাশশরাদের একজন। তুমি কি জান না সাহায্যকারী মদীনায় নেই। তিনি যুদ্ধের মাঠে রয়েছেন। পারস্য বাহিনীর সংখ্যা ও প্রস্তুতি দেখে ভয় পেয়ো না। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা কর এবং একান্তভাবে তাঁর উপর নির্ভর কর। জ্ঞান ও দৃঢ়তা সম্পন্ন কয়েকজনকে দিয়ে পারস্য সম্রাটের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দাও। যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে খেলাফতের আনুগত্য স্বীকার করে নিরাপত্তা গ্রহণের প্রস্তাব দাও, তাও যদি কবুল না করে যুদ্ধের আহ্বান জানাও। যুদ্ধ প্রস্তুতি ও প্রতিদিনের ঘটনা আমাকে অবহিত করবে।"

ইতি- আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)

❑ হযরত উমরের নির্দেশক্রমে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) ইরান সম্রাট ইয়াজদিগিরদ এর নিকট 'নোমান ইবনে মাকরানের' নেতৃত্বে দায়ীদের একটি দল পাঠালেন। তাদেরকে অপমানিত হয়ে পারস্যের দরবার থেকে আসতে হলো। 'রাবিয়া ইবনে আমের' এর নেতৃত্বে কালেমার দাওয়াত নিয়ে হাজির হলেন সেনাপতি রুস্তমের দরবারে। অহংকারী ইরানী সেনাপতির নাকি

অসভ্য, অশিক্ষিত আরব বেদুইনদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রতিনিধিদল ব্যর্থ হয়ে হযরত সাদ (রা) এর নিকট ফিরে এলেন। যুদ্ধ হয়ে উঠল অবশ্যম্ভাবী। সেদিন জোহরের নামায শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত খোৎবা দিলেন চার বার তাকবীর প্রদান করে যুদ্ধে নির্দেশ দিলেন। ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো, চার দিনের কঠিন যুদ্ধে ৩০ হাজার সৈন্য নিহত হন, এর মধ্যে দুই হাজার মুজাহিদ শহীদ হলো। সেনাপতি রুস্তম যুদ্ধে ময়দান থেকে পালাবার সময় নিহত হয়। কাদেসীয়ার বিজয় সংবাদ শুনে হযরত উমর কেঁদে ফেললেন। সিজদায় পড়ে আল্লাহ তায়ালার শুকর আদায় করেন।

❑ কাদেসীয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ইরানী সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠল। সাদ (রা) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলছে রাজধানী মাদায়ানের দিকে। সাদ (রা) শুনতে পেল ইরান সম্রাট ইয়াজদিগিরদ সমস্ত মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে ফেলছে, আসার সব পথ রুদ্ধ করার আয়োজন করছে। মাদায়ানের পূর্বে মুসলিম বাহিনী 'বাহরাসীর' দখল করে আছে। এ বাহরাসীরও মাদায়ানের মধ্যে রয়েছে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দজলা নদী। সাদ এর বাহিনী দরজলার তীরে এসে দাঁড়াল। দজলা নদীর উপর পুল ও যাতায়াত সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, সমস্ত কিস্তি তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে। পার হবার কোন উপায় নেই। সেনাপতি সে অবস্থায় মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা আজও ইতিহাসের এক স্বর্ণ দলীল। হযরত সাদ (রা) বলেন, "হে আল্লাহর গোলামেরা! হে দ্বীনের সিপাহীরা! ইরানী শাসকেরা আল্লাহর তায়ালার বান্দাহদেরকে তাদের নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। তাদেরকে বাধ্য করেছে আগুন ও সূর্যের পূজা করতে। মানুষের সম্পদ তারা অন্যায় ভাবে নিজেদের ভান্ডারে পুঞ্জিভূত করেছে। তোমাদের আগমন টের পেয়ে তারা জনগণের সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে বোঝাই করে পালাবার পথ ধরেছে। আমরা জালেমদেরকে সে সুযোগ দেব না। তারা পুল বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, কিস্তী জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইরানীরা আমাদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা জানে না আমরা আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কালকারী, পুল আর নৌকার আমরা ভরসা করি না। তোমরা আমাদের অনুসরণ কর" তিনি হাত তুললেন মহান প্রভুর নিকট বললেন,

আরবী

অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তরঙ্গ আছাড় খাওয়া দজলা নদীতে ঝাঁপ দিলেন এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী দজলা পার হয়ে গেলেন ঘোড়ার পায়ের সাথে এক কাতরা পানির স্পর্শ লাগেনি। ইরানী সৈন্যরা নিরপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এ অলৌকিক দৃশ্য দেখছিল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। 'চিৎকার করে বলে উঠল, দৈত্য আসছে, দানব আসছে, পালাও, পালাও।" মুজাহিদদের এ আকস্মিক আক্রমণে দিশাহারা হয়ে বাদশাহ ইয়াজিদগিরদ অপরিমেয় ধনরত্ন ফেলে মাদায়েন ত্যাগ করে হালওয়ানের দিকে যাত্রা করে।

❑ পরিবেশ ছিল নিথর, নিস্তব্ধ, জনমানব যেন নেই। হযরত সাদ (রা) ইরানের রাজ প্রাসাদে যখন প্রবেশ করছিলেন। তখন একটি সভ্যতার বিদায় ও আর একটি সভ্যতার জন্মের প্রসব বেদনা চলছে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সোনা দানা, রেখে যাওয়া মহা মূল্যবান তৈজশপত্র, চারিদিকে মনোরম ফুলের বাগান, পানির ফোয়ারা, আরও দৃষ্টিনন্দন কতকিছু। অতঃপর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) নয়নাভিরাম নিপুণ কারুকার্য খচিত মর্মর পাথরে নির্মিত ঐতিহাসিক শ্বেত প্রাসাদে যখন পা রাখছিলেন তখন তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আর জবান থেকে বেরিয়ে এল–

আরবী

"তারা রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ এবং কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এবং এসব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অপর এক সম্প্রদায়কে।" – সূরা দুখান : ২৫-২৮

হযরত সাদ (রা) শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করে আল্লাহ তায়ালাকে সিজদা করলেন। আট রাকাত নামায আদায় করলেন। সেদিন ছিল জুমাবার। শাহী প্রাসাদে জুমার আযান দিতে বললেন। শত শত বছর ধরে অগ্নি উপাসকদের কেন্দ্র ভূমিতে প্রথম ধ্বনিত হলো "আল্লাহু আকবার।"

❑ ৮০ বছর বয়সে তিনি যখন মৃত্যু শয্যায়, ছেলে মুসয়াবকে বললেন, "এই পুরাতন পশমী জুব্বাটি দিয়ে আমাকে কাফন দেবে। এ জুব্বা পরে বদরের মাঠে কাফেরদের সাথে আমি লড়েছিলাম। আমি এ জামা পরে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হতে চাই।"

ছেলে মুসয়াব বলেন– "আমার পিতার অন্তিম সময়ে তার মাথাটি আমার কোলের উপর ছিল। পিতার মৃত্যু আসন্ন দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন কাঁদছ? আমার

জন্যে কেঁদ না, আমার প্রভু আমাকে শাস্তি দেবেন না। রাসূলুল্লাহ (রা) আমাকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।"

❑ চারদিকে আজ নাগিনেদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। মানবতার বিরুদ্ধে চলছে হত্যার মহা আয়োজন। যদিও দস্যুদের মুখে রয়েছে শান্তির অমীয়বাণী। তারা পৃথিবীকে বানিয়েছে একটি অস্ত্রাগার। এ অস্ত্রের উপর থাকতে হবে তাদের একক অধিকার। মানবতা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, উন্নয়ন, সবকিছু তাদের হাতে আজ জিম্মী। একটি স্বাধীনদেশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়া, লাখ লাখ নারী, শিশু, বৃদ্ধ সহ নিরাপরাধ মানুষ খুন করা নাকি বিশ্ব শান্তির জন্যে জরুরী! আর সে দেশের যুবকদেরকে যারা বিরাণ হয়ে যাওয়া স্বদেশ থেকে শত্রুদের উৎঘাতে সম্মুখ সমরে আসতে না পেরে, শুধু গোপনে 'আঘাত কর, পালিয়ে যাও" এ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত ইয়াহুদীদের সাথে যারা শুধু পাথর নিয়ে লড়ছে তাদেরকে সন্ত্রাসী তালিকায় লিপিবদ্ধ করে খুন করা হবে। তাদের দেশ থেকে লুণ্ঠন আর ডাকাতি চালাচ্ছে মুসলিম তাদেরকে সমীহ করা বিবেককে হত্যা করার নামান্তর। এ তস্করদের বিরুদ্ধে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ অনিবার্য। আর সে যুদ্ধে বিজয় আনার জন্যে সাদ এর বাহিনী যেমন দরিয়ার উপর ঘোড়া দৌড়ে দিয়েছিল সে যোগ্যতা, তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল অতীব প্রয়োজন।

❑ মুসলমানেরা কখনও অধিক সৈন্যবাহিনী, বিপুল সমর সজ্জায় যুদ্ধে বিজয়ী হয়নি। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে শত্রুদের বিপুল সৈন্য ও সমরাস্ত্রের মুকাবিলায় সামান্য উপায় উপকরণ ও অল্প সংখ্যক বাহিনী আল্লাহর সাহায্যে বিজয় হয়েছে বারবার। 'কামমিন ফিয়াতিন ক্বালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসিরাতান বিইজনিল্লাহ"– আল কুরআন– অর্থাৎ কত কম সংখ্যক মানুষ অধিক সংখ্যক দলকে আল্লাহর সাহায্যে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।"

আজকের বিশ্বে সংখ্যায় মুসলমানেরা বেশী, সম্পদের প্রাচুর্য অধিক, অনেক বেশী উপায় উপকরণে সমৃদ্ধ। এত কিছুর পরও নির্যাতিত মানবতার প্রায় সকলেই মুসলমান, বাড়ী ঘর থেকে উচ্ছেদ হওয়া বিপন্ন বনি আদমের সবাই আমাদের আত্মীয়, বিশ্বের প্রতিটি দিকে নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুদের যে সর্মভেদী চিৎকার শুনা যাচ্ছে তারা সকলেই আমাদের আপনজন। এ অবস্থা আর কতকাল চলতে থাকবে? একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রক্তক্ষয়ী লড়াই যেন এর সমাধান। ক্রুসেড এর প্রস্তুতি চলছে বিশ্বাব্যাপী। দুশমনদের সর্বাধুনিক হাতিয়ার এর মুকাবেলায় আমাদের ঈমানী অস্ত্রকে শাণিত করতে হবে। আমলের বর্ম পরিধান করে যোগ্যতার ক্ষেপণাস্ত্র চালাতে হবে, আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার পাথেয় সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে জামানার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায়। যে যোগ্যতার সামনে ইরানীয়েন সাম্রাজ্য, তার সম্পদ, প্রাচুর্য, রশদপত্র সবকিছু সহ আত্মসমর্পণ বাধ্য হয়েছিল। আজকের আমেরিকান বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞ, ইসরায়েলী চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতা আর ভারতীয় অসভ্যতা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাল (রা) এর বাহিনীকে' জীবন হাতে দাঁড়াতে হবে। আরেকবার চূর্ণ করে দিতে হবে তাদের অহংকার, তুলে ফেলতে হবে তাদের বিষ দাঁত। যাদের সম্পর্কে হযরত যাবের (রা) বলেন– "নিশিত রাতে কাদেসীয়ার রণাঙ্গনে মুসলমানে সৈন্যদের তাবুগুলো আমি পরিদর্শন করছিলাম। আল্লাহর কসম! আমি একজন সৈন্যের পিঠও বিছানায় দেখিনি।" আমরা কবে তাঁদের চরিত্র অর্জন করব যাদের দিন কেটেছে জিহাদের মাঠে আর যাদের রাত কেটেছে জায়নামাযে।"

nhiZ mvC` Be‡b hwq` (iv) t
Avjvni c‡_ wbfq I `Rq

❑ তাঁর পিতা যায়িদ ছিলেন একজন তাওহীদপন্থি। মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রকাশের আগে 'বালদাহ' উপত্যকায় একবার মুহাম্মদ (সা) ও সাঈদের পিতা যায়িদ একসাথে ছিলেন। মুহাম্মদ এর সামনে দেবতার উৎসবের গোস্ত আনা হলো। মুহাম্মদ (সা) গোস্ত খেলেন না। অতঃপর যায়িদকে খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বললেন ঃ দেবদেবীর নামে জবাইকৃত পশুর গোস্ত আমি খাই না। মক্কার পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পূর্ণ পরিবেশ তার নিকট অসহনীয় ছিল। সত্যের সন্ধানে তিনি ইরাক ও সিরিয়া যান ও ধর্মীয় যাজকদের সাথে আলাপ করেন। তিনি বলেন, "আমি ইয়াহুদী ও খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে অবগত হলাম। কিন্তু আমার মন পরিতৃপ্ত হলো না। অবশেষে সিরিয়ায় এক রাহিব এর সন্ধান পেলাম। তিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। আমার মনের অবস্থা জানালাম। তিনি বললেন ঃ "হে মক্কার অধিবাসী! আপনি যে দ্বীনে হানিফের সন্ধান করছেন তা এখন নেই। তবে সত্যতো আপনার শহরে। অতিসত্তর আল্লাহ তায়ালা আপনার কওম থেকে

এমন এক নবী পাঠাবেন যিনি দ্বীনে ইব্রাহীমকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাঁর সাক্ষাত পান তবে তার অনুসরণ করবেন।"

❑ সিরিয়া থেকে মক্কার পথে আসার সময় খায়বরে বেদুইনদের হাতে যায়িদ আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। মৃত্যুর সময় আকাশের দিকে হাত তুলে সাঈদের পিতা যায়েদ ইবনে আমর মুনাজাত করেন,

'হে প্রভু, তুমি আমাকে আখেরী নবীর আগমন পর্যন্ত জীবিত রাখলে না। মহাকল্যাণ থেকে আমি মাহরুম হলাম তবে আমার পুত্র সাঈদকে এ কল্যাণ থেকে মাহরুম করবে না।"

আরবী

যায়িদের মৃত্যুর খবর পেয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল একটি শোক কাব্য রচনা করেন। মুহাম্মদ (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন– 'কিয়ামতের দিন যায়িদ ইবনে আমরের মর্যাদা একটি সত্যপথ প্রাপ্ত জাতির মত।"

পুত্র সাঈদের জন্যে যায়িদ ইবনে আমরের তথা পিতার মুনাজাত কবুল হয়েছে। মহানবী (সা) নবওয়তী দাওয়াতের প্রথমেই তিনি দ্বীন কবুল করেন মাত্র ২০ বছর বয়সে। তাঁর স্ত্রী ফাতেমাও তার সাথে ইসলাম কবুল করেন। আর এ ফাতেমাই ছিলেন হযরত উমর (রা) এর ছোট বোন।

দ্বীনের পথে যাবতীয় নির্যাতনের সামনে তিনি ছিলেন ধৈর্য ও অবিচলতার পাহাড়। এমনকি ভয়াবহ লড়াইয়ের ময়দানে অগণিত তীর, নেজার আক্রমণের মধ্যে ও অসংখ্য শত্রুর লাশের স্তুপে সাঈদ ছিলেন নির্ভয় ও দুর্জয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদানের মাধ্যমে আমি তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।

❑ হযরত সাঈদের কাছে জিহাদই সবচেয়ে প্রিয় আমল। রণাঙ্গন ছিল তার ক্রীড়াভূমি। দামেশক জয়ের পর হযরত আবু উবাইদাকে দামেশকের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন দামেশকের প্রথম মুসলিম ওয়ালী। কিন্তু জিহাদের প্রবল আগ্রহ তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি আবু ওবাইদাকে লিখলেন, "চিঠি পাওয়ার পর আমার স্থলে অন্য একজনকে পাঠান, জিহাদের ময়দান আমাকে ডাকছে। আপনারা আজও জিহাদের মাঠে, আমি প্রশাসন নিয়ে থাকতে চাইনা। সেনাপতি ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দামেশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন আর সাঈদ ইবনে যায়িদ আবার রণাঙ্গনে ফিরে গেলেন।

❑ রাসূলের নির্দেশে মদীনার বাইরে থাকতে হয়েছিল বিধায় বদরের যুদ্ধে তিনি থাকতে পারেন নি। এ ছাড়া নবীজি (সা) এর সাথে সকল জিহাদে তিনি অংশ নিয়েছেন ও বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করেছেন। রাসূল (সা) তাকে বদরের যুদ্ধের গনিমতের অংশ দিয়েছিলেন। এরপরও পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইসারের সিংহাসন পদানত করার ব্যাপারে তিনি মুসলিম বাহিনীর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ নেন ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

❑ রোমানদের সাথে মুসলমানদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল ইয়ারমুকের ময়দানে। আবু ওবাইদা (রা) ছিলেন মুসলমানদের সেনাপতি আর সাথে ছিলেন বীর কেশরী খালেদ সাইফুল্লাহ। পদাতিক বাহিনীর Commander ছিলেন সাঈদ ইবনে যায়িদ তিনি নিজেই বর্ণনা করেন।

"ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার আর রোমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখের মত। তারা অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতের মত অটল ভঙ্গিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো। তাদের অগ্রভাগে বিশপ ও পাদ্রীগণের বিরাট একদল। হাতে তাদের ক্রশ খচিত পতাকা, মুখে প্রার্থনার সংগীত। পেছন থেকে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছিল লাখ লাখ সৈন্য বাহিনী। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মত ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হচ্ছিল ইয়ারমুকের মাঠে। মুসলিম বাহিনী এ ভয়াবহ দৃশ্য ও বিপুল সৈন্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ভয়ে কিছুটা কেঁপে উঠেছিল মুসলিম সৈন্যদের অন্তরাত্মা।

সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) কৃপাণ হাতে দাঁড়ালেন। মুসলিম সৈনিকদেরকে জিহাদে অনুপ্রাণিত করে দৃঢ়কণ্ঠে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন, "হে আল্লাহর গোলামেরা! আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের কদমকে দৃঢ় করে দেবেন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! ধৈর্য হলো কুফরী থেকে মুক্তির পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় এবং এটি অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিরোধক। তোমরা তোমাদের তীর ও নেজা শাণিত করে ঢাল হাতে প্রস্তুত হও। আল্লাহর যিকির ছাড়া আর সবকিছু ভুলে যাও। আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাক।"

বক্তব্যের সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী থেকে এক যুবক এগিয়ে এসে সেনাপতি আবু উবাইদাকে বলল, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন

কুরবান করে দেব । রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পৌঁছে দিতে হবে এমন কোন বাণী কি আপনার কাছে?” সেনাপতি জবাব দিলেন, অবশ্যই! রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমার ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে দিও । রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলবে, হে আল্লাহর হাবীব, আমাদের রব আমাদের সাথে যে অংগীকার করেছে তার সবকিছুই আমরা সঠিকভাবে পেয়েছি ।” অতঃপর ‘আল্লাহু আকবর’ এর ধ্বনিতে আকাশ প্রকম্পিত করে মুসলমানেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুদের উপর ।

❑ সাঈদ (রা) বলেন, “আমি দেখলাম যুবকটি তরবারী কোষমুক্ত করে শত্রুর বূহ্যের মধ্যে হারিয়ে গেল । অদম্য সাহস নিয়ে আমি রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম । আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তর থেকে সকল প্রকার ভয়ভীতি সেদিন দূর করে দিয়েছিলেন ।” হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা) বলেন, “আমার যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ দেখেছি ইয়ারমুকে । যেদিন আমার হাতে আটখানা তরবারী ভেঙ্গে ছিল সর্বশেষ একটি ইয়ামেনী তরবারী ছিল আমার হাতে । আমি সেদিন রোমান সৈন্যদের রক্ত দিয়ে গোসল করে ফেলেছিলাম । একলাখের কাছাকাছি শত্রুদের লাশ যুদ্ধের মাঠে পড়েছিল । সে দৃশ্য ছিল ভয়াবহ । আল্লাহর সাহায্যে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম । আমার ইচ্ছা ছিল ইয়ারমুকের কঠিন ময়দানে আমি শহীদ হয়ে যাব । আল্লাহ তায়ালা সেদিনও আমার শাহাদাত কবুল করেনি ।

❑ ইসলামের জন্যে যারা কঠিন ময়দানে জীবন হাতে দাঁড়িয়েছিলেন । পৃথিবীর জীবনের আরাম আয়েশ, স্ত্রী-পরিজনের রোমাঞ্চকর স্বপ্ন, কোন কিছুই যাঁদেরকে এক চুল পরিমাণও সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি । হযরত সাঈদের জীবন তারই জ্বলন্ত উদাহরণ । মুসলিম মিল্লাতের লড়াকু সৈনিকদের জন্যে সাঈদের দৃষ্টান্ত হোক চলার পাথেয় ।

❑ আল্লাহ তায়ালার নিকট তার দ্বীনকে বিজয়ী করার লড়াই সবচেয়ে প্রিয় আমল । সালাত, সিয়াম, হজ্বে বায়তুল্লাহ এর মত ফরজ আমলগুলোও একামতে দ্বীনের সামনে অনেক কম মূল্য বহন করে । তাই জিহাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত কসর করেছেন; কাজাও হয়েছে, সিয়াম ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন ও ইহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিয়েছেন । ততদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা দুনিয়ার বুকে গৌরবের সাথে বিজয়ী হয়ে থাকে যতদিন তারা জিহাদকে তাদের জীবনের সাথে একাত্ম করে দিয়েছিল । মুসলমানদের পরাজয়ের যুগে আজ আমাদের নিকট তাসবিহ, তাহলীল, যিকির ও মোরাকাবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদের উপর অগ্রাধিকার পাচ্ছে । অথচ কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে দ্বীনের মুজাহিদের মর্যাদাই আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বোচ্চ ।

আরবী

“আল্লাহর নিকট মুজাহিদের মর্যাদা অন্যান্য ইবাদাতকারীর চেয়ে বেশী ।” (নিসা ঃ ৯৫)

হযরত সাঈদ বিন যায়িদ (রা) এর জীবনে এ বিষয়টি অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে । তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে বদরে অংশ নিতে পারেননি, এ ছাড়া রাসূলের সাথে সমস্ত যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন । এমনকি দামেশকের গভর্ণর নিয়োগ প্রাপ্ত হওয়ার পর জিহাদে যেতে অসুবিধা বিধায় তিনি শাসকের পদ থেকে দরখাস্ত দিয়ে খলীফা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন । আর ছুটে যান জিহাদের প্রান্তরে ।

আমার মনে হয় মুসলমানেরা পূর্বের মত যদি জিহাদকে তাদের জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে আর মুজাহেদানা জিন্দেগী এখতিয়ার করে তবে আমাদের হারানো ইতিহ্য, হারানো সম্পদ আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে ।

nhiZ Ave DevB`v Bebj Rvi iv n (iv) t D¤§‡Zi AvgvbZ`vi

❑ যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছেন, আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ আমীন হচ্ছেন– আবু উবাইদা ।” তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুদর্শী । তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক, বিনয়ী, মেধাবী ও সাহসী । যুদ্ধের মাঠে তিনি ছিলেন সিংহের ন্যায় বলবান তরবারীর চেয়েও ধারালো । হযরত আবু বকর (রা) এর প্রচেষ্টায় ইসলামের প্রথম যুগে তিনি ঈমান এনেছেন । আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলতেন কুরাইশদের তিন ব্যক্তি সকলের চেয়ে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও লজ্জাশীলতার জন্যে শ্রেষ্ঠ । এরা হলেন হযরত আবু বকর (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা) এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা) ।

❑ বদরের যুদ্ধের দিন সত্য মিথ্যার নির্মম সংঘাত। যেদিন পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মারামারি হয়েছিল। সে কঠিন দিনে পিতা আবদুল্লাহ আবু উবাইদা যার নাম, আমের তার দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন, তীর নিক্ষেপ করছিল রাসূলুল্লাহকে নিশান করে অতঃপর আবু উবাইদার তরবারী প্রচন্ডভাবে আঘাত হেনেছিল এ ব্যক্তিটিকে যার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছিল। এ লোকটি তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ। যদিও ঘটনাটি ছিল কষ্টদায়ক। তাই তিনি নিজ নামের স্থলে পুত্রের নাম আবু উবাইদা ও পিতা আবদুলাহর স্থলে দাদা জাররাহর নামে পরিচয় দিতেন।

❑ যদিও দ্বীন ও ঈমানকে যারা অগ্রাধিকার দিয়েছেন, পিতা পুত্রের সম্পর্কের উপর, তারা তাদের প্রভুর নিকট বেশী মর্যাদাবান। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তার প্রশংসা করে আয়াত নাযিল করেছেন।

আরবী – আল মুজাদালা : ২২

"তোমরা কখনও এমনটি দেখতে পাবে না, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনও তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে। তারা তাদের পিতা হোক কিংবা পুত্র হোক তাদের ভাই বা বংশ পরিবারের লোক হোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তায়ালা ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন। আর নিজের তরফ থেকে একটি রুহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। তারা এমন জান্নাতে দাখিল হবেন যার নিম্নদেশে নহর বয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারা ও সন্তুষ্ট রয়েছে প্রভুর উপর। এরাই আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই কল্যাণ প্রাপ্ত। –মুজাদালা : ২২

❑ উহুদের মর্মান্তিক যুদ্ধে প্রচন্ড তীরের বৃষ্টির মধ্যে নবীয়ে করিমের মস্তক মুবারকে লোহার কড়া প্রবিষ্ট হয়ে গেল, তীর বিদ্ধ হয়ে নবীজি (সা) আহত হলেন। তাঁর দান্দান শহীদ হয়ে গেল। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন সে সময় যে কয়েকজন সাহাবী রাসূল (সা) কে ঘিরে ছিলেন জীবন হাতে নিয়ে। এদের মধ্যে হযরত আবু উবাইদা (রা) অন্যতম। নবীজি (সা) এর মস্তক মুবারক থেকে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে সে কড়া বের করতে গিয়ে আবু উবাইদার নিজের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আবু উবাইদা সর্বোত্তম দাঁতভাঙ্গা ব্যক্তি।" তিনি উত্তরে বললেন, আমার দাঁত শহীদ হওয়ায় আমি খুশি হইনি, রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য আমার জীবন শহীদ হলে আমি খুশী হতাম।"

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে মুশরিকদের যে চুক্তি হয়েছিল তাতে তিনি সাক্ষীর স্বাক্ষর করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তেকালের পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে সাকীফায়ে বনি সায়েদাতে চলছিল তুমুল বাক বিতন্ডা। হযরত উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন "ওহে আনসারেরা তোমরাই প্রথম আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করেছ। আজ তোমরাই রাসূলের পরে প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়ো না।" এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রা) আবু উবাইদাকে লক্ষ্য করে বলেন "আপনি হাত বাড়িয়ে দিন আমি আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব। রাসূল (সা) আপনার সম্পর্কে বলেছেন,

আরবী

"প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে আমার উম্মতে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।" জবাবে হযরত আবু উবাইদা বলেন, "আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারবনা যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূলের (সা) ইন্তেকাল পর্যন্ত যিনি ইমামতি করেছেন।" অতঃপর হযরত উমরের (রা) প্রস্তাবে সবাই আবু বকরের (রা) হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন।

❑ তাঁর দৃষ্টান্তপূর্ণ জীবনের মধ্য হতে আমানতদারীর একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। হযরত উমর (রা) খিলাফতের প্রথম দিকে হযরত আবু উবাইদা তখন বায়তুলমাল দেখাশুনা করতেন। ঈদের আগের দিন খলীফার স্ত্রী বললেন, "আমাদের জন্যে ঈদের নতুন কাপড় নাহলেও চলবে কিন্তু ছোট বাচ্চাটি ঈদের নতুন কাপড়ের জন্য কাঁদছে।" খলীফা বললেন আমার নতুন কাপড় কিনার সামর্থ নেই। খলীফা পত্নী উম্মে কুলসুম খলীফার আগামী মাসের বেতন থেকে অগ্রিম নেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবাইদাকে খলীফার এক মাসের অগ্রিম বেতন দেয়ার জন্যে চিঠি পাঠালেন। চিঠি পাঠ করে হযরত আবু উবাইদার চোখে পানি এসে গেল। উম্মতের আমীন হযরত আবু উবাইদা বাহককে টাকা না দিয়ে সিদ্ধান্ত চেয়ে চিঠি লিখলেন, "আমীরুল মুমেনীন! অগ্রিম বেতন বরাদ্ধের জন্যে দুটি বিষয়ে আপনাকে ফয়সালা দিতে হবে। প্রথমত আগামী মাস পর্যন্ত আপনি

বেঁচে থাকবেন কিনা? দ্বিতীয়ত বেঁচে থাকলেও মুসলমানেরা আপনাকে খিলাফতের দায়িত্বে বহাল রাখবে কিনা?" চিঠি পাঠ করে হযরত উমর এত কেঁদেছেন যে তাঁর চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে গেলো। আর হাত তুলে হযরত আবু উবাইদার জন্যে দোয়া করলেন, "আল্লাহ আবু উবাইদার উপর রহম কর, তাঁকে হায়াত দাও।"

❑ সিরিয়া বিজয় হওয়ার পর সৈন্যদের মধ্যে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিল। এ ভয়াবহ রোগে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছিল। খলীফা হযরত উমর দূত মারফতে সেনাপতি আবু উবাইদাকে লিখলেন,

"মহামারী এলাকা থেকে সৈন্যদেরকে সরিয়ে নিন। আপনাকে আমার খুবই প্রয়োজন। আমার পত্রখানি যদি রাতের বেলায় আপনার কাছে পৌঁছে তবে ভোর হওয়ার পূর্বে আর যদি দিনের বেলায় পৌঁছে তবে সন্ধ্যার পূর্বে মদীনার পথে রওনা দেবেন।" খলীফার পত্র পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজন আমি বুঝেছি, যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান।"

তারপর লিখলেন, "আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার প্রয়োজন বুঝেছি। আমিতো মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি। তাদের উপর যে মুসিবত আপতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজকে বাঁচানোর প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাইনা যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করুন।" হযরত উমর (রা) চিঠিখানা পড়ে ব্যাকুলভাবে কাঁদছিলেন। তার দু' চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পানি পড়ছিল। তার কান্নায় লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল "আমীরুল মুমিনীন! আবু উবাইদা কি ইন্তেকাল করেছেন? তিনি বললেন, "না তবে তিনি মৃত্যুর পথে।" অল্প কিছুদিন পরে এ রোগে তিনি শহীদ হন। ইন্তিকালের পূর্বে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সামনে নিয়ে শেষ অসিয়ত করে বলেন, "আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা যদি তোমরা মেনে চল তবে সবসময় কল্যাণের পথে থাকবে। তোমরা সালাত কায়েম করবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে, হজ্জ ও ওমরা পালন করবে। পরস্পরকে নসিহত করবে। তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায় কথা বলবে, কোন কিছু গোপন করবে না। দুনিয়ার সম্পদে গা ভাসিয়ে দেবে না। মনে রেখো কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে, তবে আজ আমার যে পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও সে পরিণতি হবে।" মুয়াজ বিন জাবল এর উপর সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সালাম করে মুয়াজ বিন জাবল (রা) কে নামাজের ইমামতির নির্দেশ দেন। এরপরই তাঁর পবিত্র রুহ মুবারক দেহ থেকে বের হয়ে ইল্লিনের দিকে রওয়ানা করে। হযরত আবু উবাইদার (রা) লাশ মোবারক সামনে নিয়ে মুয়াজ বিন জাবল (রা) সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভাইয়েরা তোমরা আবু উবাইদার ইন্তি কালে গভীরভাবে ব্যথিত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণ দিপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে জানিনে"। হযরত মুয়াজ বিন জাবল (রা) তার জানাযার ইমামতি করলেন। মুয়াজ বিন জাবল (রা), আমর ইবনুল আস ও দাহহক বিন কায়েস কবরে নেমে তার লাশ মাটিতে শায়িত করেন। দাফন শেষে হযরত মুয়াজ (রা) সবাইকে উদ্দেশ্য করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন,

"হে আবু উবাইদা! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর কসম! আপনার সম্পর্কে আমি যতটুকু অবগত আছি আল্লাহকে হাজির জেনে ততটুকু বলতে চাই। আমার জানামতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী, বিনয়ের সাথে জমিনে বিচরণকারী। আপনি ছিলেন সেসব ব্যক্তিদের অন্যতম যারা আল্লাহর হুজুরে সিজদায় ও দন্ডায়মান অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যারা খরচের সময় অপচয় করেনা কার্পণ্যও করে না। আল্লাহর শপথ! আপনি ছিলেন বিনয়ী ও ইয়াতীম মিসকীনদের প্রতি সদয়, আপনি ছিলেন অত্যাচারী ও অহংকারীদের শত্রু।"

❑ আজকে মুসলিম উম্মতের দায়িত্বশীলদের মধ্যেও প্রকট আমানতদারীর অনুভূতি নেই। চারিদিকে যেন খেয়ানতের প্রলয় চলছে। অথচ ঐ ব্যক্তির নিকট ইসলামের কিছুই নেই যার কাছে আমানতদারীর চেতনা নেই। আমাদের একের জন্যে অপরের ইজ্জত, সম্মান, রক্ত সম্পদ ও দায়িত্ব সব কিছুই আমানত। হযরত আবু উবাইদা রা) ছিলেন বায়তুলমালের আমানতের প্রতিশ্রুতির অনুভূতি। সেনাপতি থাকা অবস্থায় সৈনিকদের হক ও অধিকারের প্রতি তার আমানতদারীর চেতনা গোটা উম্মতের জন্যে আদর্শ। আমাদের প্রতিটি আচরণ, চলার প্রতিটি পদক্ষেপ, দৃষ্টির প্রতিটি পলকে, দায়িত্বের প্রতিটি মুহূর্তে, আমানতদারীতার অনুভূতি আমাদের শিরায় শিরায় উজ্জীবিত হোক, এটাই আজকের প্রত্যাশা।

kvnv`v‡Zi Zvrch I ghv`v

❑ *fwgKv*

শাহাদাত এর উপর যখনই লিখতে গিয়েছি, তখনই কলম অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। আবেগ আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অবস করেছে। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে কর্তব্যের আহ্বানে বারবার আমাকে শাহাদাতের মিছিলে যেতে হয়েছে। হায়েনাদের গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, রক্তক্ষরিত শহীদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি অনেকবার। শহীদদের পরিবারে মাতাপিতা ভাইবোন, ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের বিলাপ ও রোনাজারিতে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বেসামাল হয়েছি বহুবার। যে শাহাদাতের মৃত্যু হৃদয়ের গহীনে লালন করছি বছরের পর বছর ধরে। আমাদের পরাজয় ও জিন্নাতীর মুক্তির দিশা। মিল্লাতে ইসলামীয়ার যুবকদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটায় সৃষ্টি করতে হবে শাহাদাত লাভের অনন্ত পিপাসা যদিও শাহাদাতের মহান মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকেই বখশিস করেন। যারা এ পথে আমাদেরকে ভয় দেখায়, আর বেশী শাহাদাত নয় এই বলে নসিহত করে তাদের কাছে জানা নেই জীবন ও মৃত্যুর আসল পরিচয়। আর যারা তাদের মস্তিষ্ক বিক্রয় করে দিয়েছে বন্ধক রেখেছে তাদের জবান ও কলম সাম্রাজ্যবাদী দানবদের হাতে তাদের কথা না বলা ও তাদের কথা না শুনাই আমাদের জন্যে কল্যাণ। আমার জ্ঞান বুদ্ধির স্বল্পতাসহ এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্যে মহান প্রভুর সাহায্য কামনা করছি। তাদের অশ্রু মুছতে গিয়ে নিজেরাই হয়ে পড়েছি অশ্রুসিক্ত। কিছুদিন আগে খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের পরপর কয়েকবার নির্বাচিত সভাপতি, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, একজন স্বার্থক ক্রীড়া সংগঠক, উঁচু মানের একজন শিল্পী, সর্বোপরি একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব দলমত নির্বিশেষে সবার প্রিয় শেখ মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন ভাই সন্ত্রাসীদের বোমার আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে ঝলসে গিয়েছেন। আর পান করেছেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। তার মৃত্যুতে আমার শরীরে প্রতিটি পশম ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। আপনজন হারানোর বেদনায় হৃদয় ভেঙ্গে চুর চুর হয়েছিল। তার স্মারক গ্রন্থে স্মৃতি চারণ করে লিখার ইচ্ছে থাকলেও আমাকে শাহাদাতের তাৎপর্য ও মর্যাদার উপর লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। আমার স্বল্প জ্ঞান ও দুর্বল হাত কতটুকু এর দাবী পূরণ করতে পারবে জানিনে, তবে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী হলে খোঁড়াও হিমালয় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে। মাবুদের একান্ত সাহায্য কামনা করে প্রবন্ধ শুরু করতে চাই।

❑ *kvnv`vZ kãwU evcK A_en*

শাহাদাতের অর্থ সাক্ষ্যদান, bear witnessd উপস্থিত থাকা, শপথ করা, declare-oath, heedful, শাহাদাত বরণ করা, প্রত্যক্ষ করা, evedence ইত্যাদি।

❑ *KiAvb Kwi‡g G kãwUi e¨envi*

কুরআন কারিমে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ব্যাপকভাবে ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

❑ সাক্ষ্যদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

সেই মহিলাটির পরিবার থেকে একজন সাক্ষ্য দিল। সূরা-ইউসুফ : ২৬

❑ দেখা, প্রত্যক্ষ করা অর্থে

"আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখছেন"। –সূরা আল বুরুজ : ৯

❑ উপস্থিত থাকা অর্থে

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসে উপস্থিত থাকবে সে সিয়াম পালন করবে"। –সূরা আল বাকারা : ১৮৫

❑ শপথ ও কসম করা অর্থে

"তবে অভিযোগকারীর একজন আল্লাহর নামে চারবার কসম করে সাক্ষ্য দেবে"। – সূরা আন নূর : ৬

❑ শহীদ অর্থে

আল্লাহর পথে জীবন দানকারী মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে কুরআনে রয়েছে।

আরবী

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেছে। সেসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভে ধন্য নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সাথী হবে আর সাথী হিসেবে তারা কতই না উত্তম"। – সূরা আন নিসা : ৬৯ অভিধানে এ শব্দটির বিবিধ অর্থ ও কুরআন কারিমে এর ব্যবহার আলোচনার পর বলতে চাই মুসলিম মিল্লাতের নিকট এ শব্দটি অতি পরিচিত, সম্মানিত আলোকিত ও আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারীদের জন্যে এই 'শহীদ' শব্দটি একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর শহীদের কুরবানী হচ্ছে শাহাদাত।

আরবী

এইভাবে তিনি সময়ের পরিবর্তন ঘটান আর মানুষের ঈমানকে পরীক্ষা করেন আর কিছু বান্দাহকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। – আলে ইমরান : ১৪০

❑ kvnv`v‡Zi Zvrch

এ শব্দটির আবেদন অনেক গভীরে। এর মধ্যে যেন একটি সমুদ্র লুকিয়ে রয়েছে। এর থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

❑ kvnv`vZ AvgiY jovB

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যারা থামেনি। কোন আঘাত কোন নির্যাতন বাধার কোন হিমালয় শহীদদেরকে তাদের লক্ষ্যচূত করতে পারেনি। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যারা নিরন্তর লড়াইয়ে ছিল সক্রিয়।

❑ kvnv`vZ Povš mv¶¨ `vb

যাদের প্রতিটি রক্ত কণা, শরীরের প্রতিটি পশম, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিতে দিতে অবশেষে নিথর হয়ে পড়েছে।

❑ kvnv`vZ me‡P‡q eo Kievbx

শহীদেরা নিজেদের জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট রাখেনি। তাদের জীবনের আরাম, আয়েশ, মায়ার হাজার বন্ধন, সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার, খ্যাতি জৌলুস, আবেগ, সোহাগ পার্থিব ও অপার্থিব, সবকিছু তিল তিল করে কুরবান করে দিয়েছে।

❑ kvnv`vZ gZ¨ bq eis Rxe‡biB Avi GK bvg

প্রত্যেকটি জীবন্ত জাতির ইতিহাসে রয়েছে জীবন উৎসর্গকারী একদল মানুষের ইতিকথা। তাদের মরণের মধ্যে একটি জাতির রয়েছে জীবন।

❑ knx‡` iv RwZi agbx

যারা ধারণ করে রয়েছে বিশুদ্ধ রক্ত, কোন মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ খুন। আজকের সম্বিত হারা মুসলিম জাতিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন শাহাদাতের তপ্ত খুন, যেদিন শহীদদের বিধবা স্ত্রীদের বিলাপ, তাদের এতিম বাচ্চাদের আর্তনাদ আর সন্তান হারা পিতামাতার আহাজারী আল্লাহর আরশে মাতম তুলবে সেদিনই রচিত হবে আর একটি নতুন পৃথিবীর ভিত্তিপ্রস্তর।

❑ knx‡` iv D¤§‡Zi ivnevi

পথহারা মুসাফিরদের জন্যে তারা দিশার ধ্রুবতারা। জাতির বধির কর্ণে তারা কান ফাটা চিৎকার। মাতৃভূমির জন্যে জীবনদানকারী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে করি Binyon যেমন বলেছেন ঃ "As the stars that are starry in the time of our dakness.

To the end. to the end, they remain."

❑ kvnv`vZ Kwgqvexi GK bvg

জীবন লক্ষ্য জীবনের চেয়ে দামী, ঐ লক্ষ্যের জন্যে জীবন কুরবান করাই জীবনের সফলতা। পৃথিবীর নগণ্য সংখ্যক মানুষই তাদের জীবনের স্বার্থকতা লাভ করেছে। বেশীরভাগ মানুষই তাদের জীবনতরীকে সফলতার বন্দরে নোংগর করতে পারে নি।

❑ kvnv`v‡Zi †kYxweb¨vm

এইবার আমি শাহাদাতের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বলতে চাই।

শাহাদাত প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত। যেমন ঃ

1. kvnv`v‡Z nwKKx

যারা সচেতনভাবে আল্লাহর রাহে তারই দ্বীন বিজয়ের প্রয়োজনে শত্রুর হাতে জীবন দিয়েছে তারা "হাকিকী শহীদ"। এরা আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত।

আরবী

অর্থাৎ- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম (সা) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, শহীদ চার প্রকার। প্রথমতঃ এমন লোক যে মজবুত ঈমানের অধিকারী, যে শত্রুর মুখোমুখি হয়

এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে গিয়ে নিহত হয়। এই ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন লোকজন চোখ তুলে এভাবে তাকাবে এতটুকুন বলে রাসূল (সা) মাথা এমনভাবে উঁচু করলেন যে, তাঁর টুপি মাথা থেকে পড়ে গেল। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, টুপি কি হযরত উমরের পড়ে গেল না কি রাসূল (সা) এর এ বিষয়টি আমার নিকট স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ এমন ব্যক্তি যে উত্তম ঈমানের অধিকারী কিন্তু সে দুশমনের মুখোমুখি হলে একটি (অজ্ঞাত) তীর এসে তাকে হত্যা করে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ের শহীদ। তৃতীয়তঃ এমন ঈমানদার ব্যক্তি যে ভাল ও মন্দ আমল এক সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে, সে শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করলো। (অর্থাৎ নিহত হলো) এই ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ের শহীদ। চতুর্থতঃ এমন ব্যক্তি যে নিজের উপর সীমাহীন বাড়াবাড়ি করলো, কিন্তু সে দ্বীনের দুশমনের মুকাবিলায় চরম সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করলো। এই ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ের শহীদ। (তিরমিযী ও বাইহাকী)

ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে সম্মুখ সমরে যারা জীবন দিয়েছে তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ১ম শ্রেণীর শহীদ।

ঈমান ও আমলে কামেলের সাথে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে বা এক পর্যায়ে পালাবার সময়ে যারা নিহত হয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ২য় শ্রেণীর শহীদ।

ঈমান ও আমলের দুর্বলতাসহ সম্মুখ যুদ্ধে যারা শত্রুর সাথে নির্ভিকভাবে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ৩য় শ্রেণীর শহীদ।

দুর্বল ঈমান কিন্তু ফিসক ও গুনাহের জীবনসহ সম্মুখ সময়ে যারা জীবন দিয়েছেন তারা মর্যাদার দৃষ্টিতে ৪র্থ শ্রেণীর শহীদ।

2. kvnv`v‡Z ûKgx

আর যারা শত্রুর হাতে যুদ্ধে নিহত হয়নি। অথচ আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে যাদের মৃত্যুকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন তারাই 'হুকমী শহীদ"। যেমন যে ব্যক্তি সারা জীবন শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ করত খালেসভাবে কিন্তু শহীদ না হয়ে ঐ ব্যক্তিটি বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করল। রাসূল (সা) বলেন –

আরবী

"যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যু বরণ করে।" (মুসলিম) এরা আসলে শহীদ হয়নি কিন্তু শাহাদাতের দরজা লাভ করবে এদেরকে 'হুকমী শহীদ' বলে।

এক হাদীসে রাসূল (সা) হুকমী শহীদদের সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন–

আরবী

রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহর পথে নিহত না হয়েও সাত শ্রেণীর মানুষ শহীদ হবে–

১. যারা মহামারীতে মৃত্যু বরণ করে ...

২. যারা পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণ করে ..

৩. যারা নিউমোনিয়া ও বক্ষব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে..

৪. যারা পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণ করে..

৫. যারা আগুণে পুড়ে মৃত্যু বরণ করে...

৬. যারা ভূমিধ্বসে মারা যায় ...

৭. যে নারী সন্তান প্রসবের সময় মারা যায়...

(আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ দুই প্রকারের শহীদদের মধ্যে পার্থক্য কিছুটা রয়েছে, মর্যাদার মধ্যে যদিও দরজায় সকলে শহীদ। ইসলামে শহীদদের মর্যাদা হুকমী শহীদদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার সাধারণ মুমিনদের মর্যাদার চেয়ে হুকমী শহীদদের মর্যাদাও অনেক বেশী।

❑ *kvnv`vZ Gi ¸i“Z*

মুসলিম জীবনে ও মিল্লাতে ইসলামিয়ার ইতিহাস বিনির্মাণে শাহাদাত অপরিহার্য এক বিষয়। ইসলামের বিজয় ও সংগ্রামের আলোচনা যেখানে হয়েছে সেখানে রয়েছে শহীদ ও তাদের কুরবানীর আলোচনা। শহীদদের রক্ত এ বিজয়কে সহজ ও অনিবার্য করেছে। এর সীমাহীন গুরুত্ব লিখে শেষ করা কঠিন। এবার আমি ইসলামে শাহাদাতের গুরুত্ব এ বিষয়ে বলতে চাই।

❑ *bex‡`i cewnZ L‡bi `wiqv*

এটা এতই গুরুত্ব পূর্ণ যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে অসংখ্য নবীদের রক্তের কুরবানীর প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। সমস্ত উম্মতের ধমনীতে যত বিশুদ্ধ রক্ত রয়েছে এর সবটুকুন জমা করলেও যে বিশাল খুনের সাগর সৃষ্টি হবে নবীদের এক কাতরা খুনের দাম এর চেয়েও বেশী। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে জলন্ত অনলে যেমন নবীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তেমনি কামান, গোলার হাত থেকেও নবীদের বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু না, তিনি দ্বীনের জন্যে নবীদের ও তাদের সঙ্গী সাথীদের বেঁচে থাকার চেয়েও তাঁদের জীবন কুরবানীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সবর করেছেন নবীদের পড়ে থাকা লাশ ও তাদের বয়ে যাওয়া রক্ত প্রবাহ দেখে।

আরবী

'যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে আর অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং যারা মানুষদেরকে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করে সে সকল দায়ীদেরকে কতল করে তাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের শুভ সংবাদ দাও"। – সূরা আলে ইমরান : ২১

❑ kvnv`vZ †PZbvi we‡ùviY

ঘুমন্ত একটি জনপদ, অচেতন একটি মানবগোষ্ঠীকে জাগাবার জন্যে শাহাদাত চেতনার বিস্ফোরণ। ইস্রাফিলের বজ্র নিনাদ, এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প। শত শত শিক্ষাশিবিরের বক্তব্য ও বিশ্ববরেণ্য আলোচকদের হাজারো আলোচনার চেয়ে শাহাদাত বেশী ভারী ও আবেগ সৃষ্টিকারী। শহীদদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা চেতনার সঞ্জিবনী। শাহাদাত জাতীয় যুবমানসে সৃষ্টি করে শাহাদাতেরই অদম্য জজবা। কোন অত্যাচার, হুমকি, ভয় ও প্রাচুর্য, লোভ লালসা দিয়ে তাদেরকে দমিয়ে রাখা যায় না। খুনীদের বিরুদ্ধে তারা এক একটি জীবন্ত বোমায় পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের রক্ত গড়ে তোলে প্রতিরোধ।

❑ kvnv`vZ Rvbv‡Zi ivRc_

মাবুদের নৈকট্য হাসিল করা ও তাঁরই দিদারের রোমাঞ্চকর মোহনায় মিলিত হওয়ার যত পথ রয়েছে শাহাদাতের খুনে রঞ্জিত পথ সবচেয়ে প্রশস্ত ও সংক্ষিপ্ত। দ্বীনের পথে সমস্ত ত্যাগ ও কুরবানীকে আল্লাহ তায়ালা বান্দার পক্ষ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন।

কুরআন বলছে ঃ

আরবী

"তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম ঋণ দাও। যা কিছু তোমাদের পক্ষ থেকে ঋণ হিসেবে অগ্রীম পাঠাবে উহা তোমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সঞ্চিত মওজুদরূপে পাবে এবং পাবে অনেক গুণ বড় হিসেবে সেটাই তোমাদের জন্যে উত্তম।" মুযযাম্মিল : ২০

বান্দারা আল্লাহ তায়ালাকে যত ঋণ দিয়েছে সবচেয়ে উত্তম ঋণ দিয়েছেন শহীদেরা। তারা মাবুদকে রক্ত ঋণ দিয়েছে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে দামী। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর সর্বোচ্চ বিনিময় ঘোষণা করে বলা হয়েছে–

আরবী

"যারা আমার জন্যে হিযরত করেছে, বাড়ীঘর থেকে বহিস্কৃত হয়েছে" নির্যাতিত হয়েছে, আমার জন্যে লড়াই করেছে ও শাহাদাত বরণ করেছে আমি তাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেব এবং এমন বাগিচায় স্থান দেব যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। আল্লাহর নিকট সেটাই তাদের ঋণের বিনিময় আর উত্তম প্রতিফল শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে।" সূরা আলে ইমরান : ১৯৫

যারা আল্লাহর হাতে রক্তের ঋণ দিয়েছে। খুনের নাজরানা পেশ করেছে তারাই সফল, তারাই কামিয়াব।

❑ kn‡`i i³ e_v hvq bv

তাদের রক্ত কথা বলে। হুংকার দিয়ে উঠে যেন শত কামানের গর্জন। আমাদেরকে নসিহত শুনায় জিহাদ ও শাহাদাতের আলোচনা আর নয়, এবার হেকমাত ও বিজয়ের গল্প বল। ওরা জানেনা সমস্ত বিজয় ও সফলতা রয়েছে শাহাদাতের গর্ভে।

সভ্যতার প্রতিটি ইটের সাথে রয়েছে শহীদের রক্তের দাগ। শহীদের সাগর সাগর রক্ত যুদ্ধ করেছিল ইরানের মাঠে। জালেম শাহের তখত তাউস ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছিল। উড়িয়েছিল ..... খচিত ইসলামী বিপ্লবের বিজয় কেতন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ আমেরিকার জিম্মি উদ্ধার প্রচেষ্টার নামে ভয়াবহ বিমান আক্রমণ তাবাহ করে দিয়েছিল ইরানের তাবাস শহরে।

আরবী

"জবাবে তাদের প্রভু আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নারীপুরুষ কারো ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও রক্ত বৃথা যেতে দেব না।" –আলে ইমরান : ১৯৫

❑ knx‡`i mv‡_ Avjvni Iqv`v

ইসলামকে বিজয়ের মঞ্চে যারা আসিন করতে চায়। কুরআন শরীফ হোক বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার Guide book, এ স্বপ্ন যারা হৃদয়ে লালন করে তাদের সামনে কোন সহজ পথ নেই, তাদেরকে সমগ্র-জীবন জিহাদের তাঁবুতে জীবন কাটাতে হবে। পার হতে হবে হিজরতের এক ছায়াহীন তপ্ত মরু। সাঁতরিয়ে যেতে হবে শাহাদাতের বিশাল খুনের দরিয়া। রাসূল (সা) কেও অতিক্রম করতে হয়েছে হিজরতের কঠিন মনযিল। তার সামনে হাজির হয়েছে ওহুদ, বদর ও হোনায়নের রক্তাক্ত রণ প্রান্তর।

যারা দ্বীনের জন্যে মজলুম হয়েছে, শরীরের এক একটি অঙ্গ যাদের বিচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু তারা অধৈর্য হয়নি, তাদের সহায় সম্পদ অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, বছরের পর বছর কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয়েছে। তাদের সমস্ত মৌলিক মানবিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। এরপরও তাদেরকে কামানের নিশান বানানো হয়েছে। ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ফাঁসির মঞ্চে। শহীদের রক্ত ভেজা মাটিকে আল্লাহ তায়ালা লড়াকো মোস্তাদআফীনদের হাতে তুলে দেয়ার অলংঘনীয় ঘোষণা দিয়ে বলেন–

আরবী

'জমিনে আমার জন্যে নির্যাতিত ও মজলুমদের হাতে আমি সে জমিনের নেতৃত্ব ও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে অনুগৃহিত করব।" কাসাস : ৫

❑ kvnv`vZ Cgv‡bi `vex

ঈমানের দাবী শুধু আনুষ্ঠানিক কতকগুলো ইবাদাত পালন করা নয়। মুমিনের সমগ্র জীবন, জীবনের সমগ্র বিষয় ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সবকিছুতে ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ থাকতে হবে। মুমিনের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি, নড়াচড়া, যবানের প্রতিটি বুলি, চাহনির প্রতিটি পলকে সত্যের সাক্ষ্য দিতে হবে। জীবনকে শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় পরিচালিত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জানমালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। কুরআন বলছে ঃ

আরবী

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন আর তারা এই জানমাল দিয়ে লড়াই করবে, মারবে আর নিজেরাও মরবে– শাহাদাত বরণ করবে"। সূরা আত-তাওবা : ১১১

কুরআন স্পষ্ট করে বলে দিল ঈমানের চূড়ান্ত দাবী হলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার কঠিন লড়াই যেখানে মিলবে শাহাদাতের প্রত্যাশিত মর্যাদা। শহীদের প্রবাহিত খুনের ফোঁটা আল্লাহর অতি প্রিয় ইসলামের জন্যে জীবন দেয়ার অনুভূতি কারো হৃদয়ে যতক্ষণ জাগ্রত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হৃদয়ে ঈমানে কামেলের অস্তিত্ব নেই। আর মুনাফিকদের ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য নয়।

গোটা জাতীকে আজ যদি নিশ্চিত প্রলয়ের সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে কেউ রক্ষা করতে চায় তবে তাদের হৃদয়ে আল্লাহ, রাসূল (সা) ও দ্বীনের জিহাদকে উজ্জীবিত করতে হবে। জীবন ও মরণকে তার জন্যে নির্ধারিত করতে হবে। মুসলিম জাতির সমস্ত যুবকদেরকে আজ কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়াতে হবে শহীদি ঈদগাহে। শত্রুদের হাজার মারণাস্ত্র ও বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র দেখে ভড়কে গেলে চলবে না। যা আছে তা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইব্রাহীম (আ) এর ধারাল তরবারীর নিচে মাথা টেনে দিয়ে ইসমাইল শাহাদাতের যে ঘোষণা দিয়েছিল, মরণের সে সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহত রয়েছে জীবনের জীবন।

আরবী

"হে পিতা আমাকে জবাই করুন, ইনশাল্লাহ আমি ধৈর্য ধারণ করব।" – সূরা সফফাত : ১০২

❑ kvnv`v‡Zi gnvb ghv`v

শাহাদাতের মর্যাদা এ বিষয় প্রয়োজন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার। কুরআন পাকে ও হাদীসে রাসূলে (সা) এ বিষয়ে রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা। তার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলো।

❑ kvnv`vZ Avjvn Zvqvjvi AbMn

ইসলামে শহীদদের মর্যাদা কুরআনের আয়াতে স্বীকৃত। নবীদেরকে আল্লাহ তায়ালা যেমন বাছাই করেন শহীদদেরকেও আল্লাহ তায়ালাই Select করেন-

আরবী

"আমি তোমাদের মধ্য থেকে যাকে চাই শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করি"।

হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ (রা) ইসলামের বড় বড় যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেছেন, হাজার হাজার শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ইয়ারমুকের কঠিন যুদ্ধে এক লাখের উপর শত্রুর লাশের স্তূপে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন। খালিদের হাতে সেদিন আটখানা তরবারী ভেঙ্গে ছিল, রক্তে তিনি গোসল করে ফেলেছিলেন। শত শত তরবারীর ও নেজার আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে অথচ আল্লাহ তায়ালা তাকে যুদ্ধে নিহত হয়ে শাহাদাত লাভের সৌভাগ্য দেননি। তাই তিনি মৃত্যুর বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদছিলেন। শাহাদাত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে তার জন্যে বাছাই করেন।

❑ *knx‡`iv Agi*

যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে কুরআনে তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ নবীদের জন্যেও মৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন বলছে−

আরবী

“হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি উপস্থিত ছিলেন, যখন ইয়াকুব (আ) মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।” − সূরা বাকারা : ১৩৩

এটি এমন এক অনন্য মর্যাদা যা আল্লাহ তায়ালা শুধু শহীদদের জন্যে খাস করেছেন। শহীদেরা অমর, চিরঞ্জীব মৃত্যু কখনও তাদেরকে স্পর্শ করবে না। শাহাদাতের মাধ্যমে তারা মৃত্যুহীন জীবন সমুদ্রে মিশে যায়, এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য।

আরবী

আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না প্রকৃত পক্ষে তারাই জীবন্ত কিন্তু তোমাদের চেতনা নেই। − বাকারা : ১৫৪

❑ *knx‡`i Lb AiZ cieÎ*

যে খুন জীবন্ত হয়ে কথা বলে, সৃষ্টি করে বিপ্লবের আগুন, প্রতিটি কাতরা খুন শত্রুদের জন্যে তৈরী করে মরণ ঘাঁটি, যে রক্ত বৃথা যায় না। যে খুন অপরাধসমূহ ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ওহুদের ৭০ জন শহীদের রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত লাশ সামনে নিয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে তাদের কুরবানীর সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করা হোক। হযরত যাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ

আরবী

“রাসূল (সা) বলেন, হে শহীদগণ তোমাদের কুরবানী বিষয়ে আমি আল্লাহকে সাক্ষী দেব অতঃপর তিনি শহীদদের গোসল ও সালাত ছাড়া রক্তাক্ত দাফনের নির্দেশ দেন”। −বুখারী

❑ *knx‡`i gZ¨i hvZbv †bB*

সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর কষ্ট সকল বেদনাকে হার মানায়। দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে নবীদের পরে সম্মানিত ব্যক্তিটি সাইয়্যেদেনা আবু বকর (রা) মৃত্যুর বিছানায়, বার বার হুঁশ আসে আর যায়, আর তিনি বলতে ছিলেন−......

‘নিশ্চয় মৃত্যু কষ্টদায়ক”।

মৃত্যুর যাতনা এতই অসহ্য হবে যে কুরআন পাক এ কষ্টের উপর কথা বলেছে

আরবী

“এই মৃর্তুর যাতনা এক চরম সত্য, তা থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াতে। − ক্বাফ : ১৯

রাসূলে কারিম (সা) নিজে মওতের সাকরাত থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য চেয়েছেন। এমন মওতের বেদনা ও কষ্ট শহীদদের শুধু হবে না। তারা জান্নাতে তাদের অবস্থান কত রোমাঞ্চকর সেই অবস্থা দেখে দেখে মৃত্যু বরণ করবে।

আরবী

“শহীদদেরকে তাদের জান্নাতের অবস্থান মৃত্যুর পূর্বে দেখানো হবে।” − তিরমিযী

কোন বেহেশতী জান্নাতের বাগান ছেড়ে পৃথিবীতে আসতে চাইবে না একমাত্র শহীদেরা আসতে চাইবে। তাদেরকে যে কষ্ট দিয়ে শহীদ করা হচ্ছিল তাতে তারা যে আনন্দ লাভ করবে তা জান্নাতের নিয়ামতের চেয়েও মজাদার।

ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী হযরত আবদুল্লাহ (রা) এর কুরবানীর উপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করেন−

আরবী

হে বান্দা আমার কাছে কি চাও?

“জবাবে আবদুল্লাহ বলেন, প্রভু আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠাও আমি আবার তোমার পথে শাহাদাত বরণ করব ।” কুরতুবী

❑ knx‡`i mg¯Í¸bvn gvd K‡i †`qv n‡e

শহীদের কোন গুনাহ এর উপর আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করবেন না । আল্লাহর হক্কের ব্যাপারে সকলের সমস্ত অভিযোগ তাদের উপর থেকে প্রত্যাহার করা হবে । সমস্ত অপরাধের উপর যেদিন কঠিন হিসাব নিকাশ হবে পাপ এর কম বেশীর উপর জান্নাত জাহান্নামের ফায়সালা হবে । যে অপরাধ অসংখ্য মানুষের জন্যে নির্ধারণ করবে জাহান্নামের আগুন । শহীদদেরকে সে পাপের উপর কোন প্রশ্নই করা হবে না । তবে হ্যাঁ বান্দার হক্ব মাফ হবে না । রাসূল (সা) বলেন–

আরবী

“আল্লাহ তায়ালার নিকট শহীদদের যে ছয়টি মর্যাদা রয়েছে । এর

প্রথম ঃ “শহীদের রক্ত জমিন স্পর্শ করার আগে তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করা হবে” । শাহাদাত সমস্ত গুনাহের কাফফারা । হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন । “কিয়ামতের দিন শহীদদেরকে এমন অবস্থায় হজির করা হবে যখন তাদের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বইতে থাকবে ।” –মুসলিম

অতঃপর ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করবেন এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলবে মাবুদ এরা শহীদ হয়েছিল । আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমরা সাক্ষী থাক আমি এদের গুনাহ মাফ করেদিলাম । তবে মানুষের প্রাপ্য বা ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে । আল্লাহর পথে জীবন দেওয়ার পরও তা মাফ হবে না । রাসূল (সা) বলেন ঃ

আরবী

“শহীদদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে কিন্তু ঋণ ছাড়া ।” –মুসলিম

❑ knx‡`i Ke‡i Avhve n‡e bv

আখেরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে প্রথম ঘাঁটি কবর । মৃত্যু থেকে পুনরায় কিয়ামতের মাঠে জমায়েত পর্যন্ত হায়াত কবর বা বরযখ ।

আরবী

“হযরত উসমান (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন– কবর আখেরাতের কঠিন ঘাঁটিসমূহের মধ্যে প্রথম এখানে যার মুক্তি আছে তার জন্যে পরবর্তী ঘাঁটি সমূহ সহজ হয়ে যাবে । আর এ ঘাঁটিতে যার নাজাত হবে না পরবর্তী ঘাঁটি সমূহ আরও কঠিন হবে ।” – বুখারী

বদকারদের জন্যে কবরে রয়েছে অনেক কষ্টদায়ক আযাব । রয়েছে বিষাক্ত সাপের দংশন, আগুনের দাহ ও নানা প্রকার অবর্ণনীয় বেদনা ।

আল্লাহ তায়ালা শহীদদেরকে কবরে কোন প্রকার আযাব দেবেন না । শহীদের রক্ত মাখা কফিন পর্যন্ত মাটি স্পর্শ করবে না ।

আরবী

“রাসূল (সা) বলেন, শহীদদের কবরে কোন আযাব হবে না ।” । – তিরমিযী

শত বছর পরও তাদের লাশ অক্ষত থাকবে । এটা একটি বিরাট মর্যাদা । ওহুদের যুদ্ধের প্রায় অর্ধশত বছর পর হযরত আমীরে মোয়াবিয়ার জামানায় মুসলমানদের জন্যে একটি খাল খনন করা প্রয়োজন ছিল । পথে ওহুদের কয়েকজন শহীদের কবর পড়ে গেল । তিনি শহীদের আত্মীয় পরিজনদেরকে তাদের লাশ উঠিয়ে অন্য জায়গায় দাফনের জন্যে বলেন । ৫৪ বছর পরে কবর থেকে শহীদদের অক্ষত লাশ কফিনসহ উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করা হয়েছিল । খননের সময় একটি শহীদের শরীরে কোদালের আঘাত লেগে ফিনকি দিয়ে টাটকা রক্ত বের হয়ে এল । পরে Bandage ব্যান্ডেজ করে রক্ত বন্ধ করে লাশ দাফন করা হয় । সুবহানাল্লাহ ।

❑ knx`‡`i‡K wKqvg‡Zi gv‡V m¤§vwbZ Kiv n‡e

কিয়ামতের মাঠ যে কত ভয়াবহ হবে তা বর্ণনা করা কঠিন । এটি একটি ব্যাপক আলোচনার বিষয় ।

আরবী

“যে দিন আল্লাহ তায়ালার রাগ দেখার পর সকল মানুষদের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে শুধু একটি অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শুনা যাবে না ।” – ত্বোয়া-হা : ১০৮

যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না । আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না ।

সে দিন তাদের কোন প্রকার আযাব হবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষতস্থান থেকে তাজা রক্ত বের হতে দেখে বিনা হিসাবে ছায়ায় স্থান দেবেন ও সম্মানিত করবেন।

আরবী

"কঠিন বিপদের দিনে তারা থাকবেন বিপদমুক্ত"। - তিরমিযী

❑ knx`‡`i gv_vq ZvR civ‡bv n‡e

সেদিন সকল মানুষ কঠিন হিসাবে থাকবে দন্ডায়মান সেদিনকে দেখার পর বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে।

আরবী

'যে দিনকে দেখার পর বালকেরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে– মুযযাম্মিল : ১৭

যেদিন বন্ধু আপনজন একে অপরের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন শহীদদেরকে সম্মানিত করা হবে। রাসূল (সা) বলেন,

আরবী

"শহীদদের মাথায় এমন সুন্দর ও মূল্যবান তাজ পরানো হবে যা হবে ইয়াকুত নির্মিত। দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ শহীদদের একটি টুপির চেয়ে কম মূল্য বহন করে।" –তিরমিযী

❑ knx`‡`i mv‡_ weevn

যে কঠিন সময়ে মানুষেরা পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে হিসাব নিকাশে ব্যস্ত সে ভয়াবহ কিয়ামতের মাঠে শহীদদের জন্যে হবে রোমাঞ্চকর বিবাহ অনুষ্ঠান। যেদিনের জন্যে সমস্ত মামলাকে মূলতবী করে রাখা হয়েছে কুরআন বলছে–

আরবী

"কোন দিনটির জন্যে তাদের সববিষয় মূলতবী রাখা হয়েছে? সে ফয়সালার দিনটার জন্যে। আপনি কি জানেন ফয়সালার দিনটা কেমন? সে দিন সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্যে ভয়াবহ দুর্যোগ।" –মুরসালাত : ১২-১৫ সমস্ত কিয়ামতের মাঠ হতবাক হবে এমন কঠিন দিন।

"আল্লাহ ৭২ জন হুরকে একজন শহীদের সাথে বিবাহ দেবেন। যারা হবে অপরূপা।" তিরমিযী

আরবী

❑ knx`‡`i c¶ †_‡K mcwik Kiv n‡e

যে দিন মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে। সন্তান তার পিতা মাতার পরিচয় মনে রাখবে না। কারো পক্ষে অপরের জামিন গ্রহণ করা হবেনা। সে দিনটির ভয়াবহতা সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে নেবে। কুরআন বলছে ঃ

আরবী

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজ পিতা, স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাতে থাকবে।" – আবাসা : ৩৪-৩৬

সে দিন আল্লাহ তায়ালা শহীদদেরকে নিজ বংশের গুনাহগারদের বিষয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে সম্মানিত করবেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ

আরবী

"শহীদদেরকে ৭০ জন গুনাহগার আত্মীয় পরিজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নেবার অনুমতি প্রদান করা হবে।" (তিরমিযী)

দশটি মর্যাদার দিকে আমি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম।

❑ kvnv`v‡Zi Zvgvbv

শাহাদাতের তামান্না একটি ইবাদাত। নবীয়ে করিম (সা) নিজেই শাহাদাত এর আরজু পেশ করেছেন। প্রায় সমস্ত সাহাবীদের জীবনে এর নজির পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শাহাদাতের আকাঙ্খা মৃত্যুর বিছানায় হযরত খালেদ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করে বলছিলেন, "আমার জন্যে এ মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টদায়ক"। হযরত আলী (রা) বলতেন, বিছানায় গড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা আমার কাছে এক হাজার তরবারীর আঘাত সহ্য করার চেয়েও কষ্টদায়ক।"

মহিলা সাহাবীদের সন্তান প্রসব হলে শিশুকে নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে বলতেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সন্তান আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়ার জন্যে দোয়া করুন।" নবীজি (সা) হেসে বলতেন, তুমি মা হয়ে কি সন্তানের মৃত্যুর জন্যে দোয়া চাচ্ছ? তারা বলতেন না হুজুর! আপনিত বলেছেন যারা আল্লাহর পথে জীবন কুরবান করে তারাই বেঁচে থাকে তারা কোনদিন মরবে না।

আরবী

"তোমরা তাদেরকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করো না বরং শহীদেরাই জীবিত শাহাদাতের সাথে সাথে তারা জান্নাতের রিযক গ্রহণ করে"। -আলে ইমরান

এক্ষেত্রে রাসূলে কারিম (সা) এর শাহাদাতের তামান্না প্রণিধান যোগ্য–

আরবী

"আবু হুরায়রা (রা) নবীজি (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (নবীজি) বলেন, আল্লাহর কসম। আমার হৃদয় একান্তভাবে চায় আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হই, অতঃপর আবার জীবিত হই, আবার যুদ্ধ করে নিহত হই, আবার জীবিত হই।" – বুখারী

কেউ চাইলে শহীদ হবে না। কারণ এটা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে চান শুধু তাকেই দান করেন। তবে শাহাদাতের তামান্না এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যিকার অর্থে যারা শাহাদাতের কামনা হৃদয়ে পোষণ করে তারা যদি বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শহীদদের মধ্যে জায়গা দেয়া হবে। শাহাদাতের কামনা যে হৃদয়ে জাগ্রত হয়নি, তা থেকে মুনাফেকী বিদুরিত হয়নি।

আরবী

"যে মুজাহিদ সত্যিকারভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।" –মুসলিম

❑ kvnv`v‡Zi c‡_ evavmgn

মুমিনদের হৃদয়ে রয়েছে শাহাদাতের দুর্নিবার আকাঙ্খা। কিন্তু সফলতার মঞ্জিলে পৌঁছবার পূর্বে অতিক্রম করতে হবে বাধার পাহাড়। এ পথে বাধা সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

❑ m‡›`nh³ Cgvb

এ পথের পহেলা সমস্যা হলো আল্লাহ ও রাসূলের উপর সন্দেহ যুক্ত ঈমান। সন্দেহ ঈমানের ব্যাধি। আখেরাতের জিন্দেগীর উপর যার পূর্ণ ঈমান নেই সে কেমন করে জীবন দেয়ার মত এতবড় ত্যাগ স্বীকার করবে। সন্দেহের বিমারী নিয়ে কিছু দূর পথ অতিক্রম করলেও শাহাদাতের এ মর্যাদাপূর্ণ মঞ্জিলে পৌঁছা কোন মতে সম্ভব নয়। এ পথের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সে বার বার থমকে দাঁড়াবে আর বলবে–

আরবী

"আল্লাহ ও রাসূল আমাদেরকে সাহায্যের যে ওয়াদা করেছে সেটা প্রতারণা।" – সূরা আহযাব : ১২

❑ `wbqvi gvqv

শাহাদাতের পথে চলার সিদ্ধান্ত যারা নেবে তাদের সামনে আর একটি বড় বাধা পৃথিবীর মায়া। পিতামাতা, সন্তান, পরিজন, সঞ্চিত সম্পদ, আরাম আয়েশের হাজার লোভনীয় উপকরণ মুজাহিদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে। এ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে সামনে আগুয়ান হওয়া কঠিন।

আরবী

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদেরকে যখন খোদার রাহে লড়াই করতে বলা হয় তখন তোমরা পৃথিবীর মাটি কামড়িয়ে থাক। তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়াকে অধিক ভালবাস? তবে জেনে রাখ দুনিয়ার এ আরামের সামগ্রী পরকালে খুব সামান্যই পাওয়া যাবে।" আত-তাওবা : ৩৮

কিন্তু যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসা গালেব রয়েছে। অনুভূতির ব্যঞ্জনা রয়েছে প্রতিটি শিরায় শিরায় রয়েছে ইশকে ইলাহী, সে প্রভুর জন্যে জীবন দেয়ার ডাক যখন শুনবে তখন সে এমন পাগল হয়ে যাবে মেঘের গর্জন শুনে ময়ুর যেমন পেখম খুলে দেয়। মুজাহিদেরা দুনিয়া ত্যাগ করবে না বরং দুনিয়ার মালিককে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেবে। মহান মনিবের ডাক আসলে বধির হয়ে যাবে সব শুনা থেকে, বোবা হয়ে যাবে সকল ডাকের জবাব দিতে। ছিড়ে ফেলবে সকল মায়ার বাঁধন মহান প্রভুর সাথে মিলনের অনিবার্য প্রয়োজনে।

❑ gi‡Yi fq

মৃত্যু জীবনের জন্যে অবধারিত। এটি আল্লাহর এক নির্দেশ। হাজার আয়োজনে যেমন তার আগমন ঘটানো যায় না তেমনি হাজার প্রতিরোধে তার আগমন ঠেকানো যায় না। সৃষ্টির এক বিন্দু ক্ষমতা এর উপর নেই ও চলে না। আল্লাহই এর একছত্র নিয়ন্ত্রক।

অহেতুক হলেও সৃষ্টির কলিজার মধ্যে এ মরণের ভয় বাসা বেঁধে আছে যুগযুগ ধরে। কিন্তু আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের জন্যে মৃত্যু কোন বিভীষিকা নয়, নয় ভয়ের কোন কারণ। মরণ শহীদদের কাছে মরণ নয় জীবনের খবর।

শাহাদাত পিয়াসীদের হৃদয় থেকে মরণের মিথ্যা ভয় মূল শুদ্ধ টেনে ফেলে দিতে হবে। ইসলামের বিজয়ের যুগে মুমিনেরা শাহাদাতকে এইভাবে পান করেছিল তৃষ্ণার্ত বেদুইন যেভাবে ঠান্ডা পানি পান করে।

আরবী

"মুত্যুর সিদ্ধান্ত যখন হবে তখনই আসবে এক মুহূর্ত আগেও নয় পরেও নয়।" – আরাফ : ৩৪

মুসলিম জাতির পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করে নবীজি (সা) বলেন, সংখ্যার আধিক্য, উপায় উপকরণের প্রাচুর্য থাকার পর মুসলমানদের পরাজয় ঠেকানো যাবে না। দু'টি রোগের চিকিৎসা না হলে মুসলমানদের বাড়ী ঘর, সহায় সম্পদ, পিতামাতা, ছেলে সন্তানের জীবন, তাদের মা বোন স্ত্রী পরিজনদের ইজ্জত আব্রু সবকিছু দুশমনদের হাতে বিনাশ হতে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলকে (সা) প্রশ্ন করেন, সেই ভয়াবহ কারণ দুটি কি? রাসূল (সা) বলেন–

আরবী

'সেটা হচ্ছে দুনিয়ার মায়া ও মরণের ভয়।" –আবু দাউদ

❑ *Dcmsnvi*

পৃথিবী আজ একটি অনিবার্য পরিবর্তনের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা পচনের শেষ অবস্থায়। একটি সভ্যতা টিকে থাকার জন্যে যে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক মান থাকা দরকার এ সভ্যতার আর কোন Values অবশিষ্ট নেই।

নৈতিক অবক্ষয়, বীভৎস যৌনাচার, উশৃংখল ভোগবাদ, সীমাহীন মারণাস্ত্র তৈরি, মিথ্যা প্রচারণা, কুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক চর্চা, মারাত্মক সংশয়বাদ এ সভ্যতার গায়ে এক একটি Cancerous tumour. নৈতিক নৈরাজ্য, সিফিলিস, গণেরিয়া, AIDS আক্রান্ত এ পাশ্চাত্য সভ্যতার মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সভ্যতা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর জীবনী শক্তি আর নেই। এর ডানায় উড়ার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, "Those wings are no longer wings to fly. T.S. Eliot তবে একটি নতুন সভ্যতার আগমন না হলে এ জীর্ণ সভ্যতা আরও বহুদিন টিকে যাবে। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা অকালে মৃত্য বরণের পর ইসলাম ছাড়া আজ আর কোন নতুন সভ্যতার অস্তিত্ব নেই। Those who are carrying the loads of new civilization. যারা এ নতুন সভ্যতা বিনির্মাণের নির্মাণ সামগ্রী বহন করছে তাদেরকে এই জীর্ণ ও বিদায়ী সভ্যতার সাথে এক আপোষহীন 'সভ্যতার সংঘাতে' জড়িয়ে যেতে হবে। সেটা হবে কঠিন, রক্তাক্ত ও দীর্ঘ মেয়াদী। নতুন সভ্যতার কারিগরদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সভ্যতা সৃষ্টির ইতিহাস ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস। কি পরিমাণ রক্ত এর জন্য ঢেলে দিতে হবে আর কত জনপদ নিঃশেষ হয়ে যাবে সে পরিমাণ অপরিমেয়। হয়তো তাদের খুনের পরিমাণ অতলান্ত দরিয়ার পানিকে ছাড়িয়ে যাবে। আর শহীদের সংখ্যা সাহারার বালুকা রাশিকে হার মানাবে। আমাদের হাজার হাজার প্রিয় সন্তানদের সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার, পিতামাতার রোমাঞ্চকর আবেগ, আপনজনদের মধুময় স্মৃতি, মনের কোণে লালিত রচনায় কুরবানী করার নিতে হবে কঠিন সিদ্ধান্ত। শহীদ মালেক ভাই সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছিলেন, 'বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকেরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় সত্যের প্রতিষ্ঠা করব নচেৎ এ প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।"

mgvß